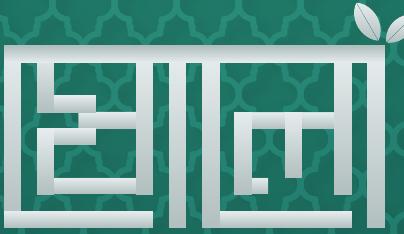


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



রমাদান এবং ঈদ সংখ্যা। ১০২১

রমাদান এবং ঈদ

আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশ্ব নিয়ামত

আলোকিত করে মনের দুয়ার
এলো মাহে রামাদান
ধুঁয়ে মুছে যাক সব পাপ
দিয়ে মুক্তির সমাধান

ঝতুরাজ বসন্ত যেমন প্রকৃতিতে সঞ্চার করে নতুন প্রাণ, বৃক্ষে বৃক্ষে আসে নবপল্লব আর কচি শাখা; রমাদানও ঠিক একইভাবে পুনরঞ্জীবিত করে তোমে মুমিন হৃদয়কে। ঝিমিয়ে যাওয়া ঈমানকে চাপ্দা করে দিতে আর অগণিত গুনাহগুনোকে ঝরিয়ে দিতেই মাছে রমাদানের আগমন ঘটে আমাদের জীবনে। তবে আফসোসের বিষয় সেই রমাদানের সাক্ষাৎ আমরা জীবনের অনেকগুনো বছরে পেয়ে থাকন্মেও হাসিন করতে পারিনি রমাদানের আসন্ন উদ্দেশ্য।

এবারে তাই একটু ভিন্ন আপিকে চিন্তা করতে, ভিন্ন আপিকে দেখতে; রমাদানকে নিয়ে গল্প সাজানো যাক। তোমাদের রমাদানের অনুভূতি তৈরি হোক ঘোন্মোর সাথে, ঈমানের পথে। আর দীর্ঘ এক মাস ইহসানের সাথে সাওম পান্নন করে এবারের ঈদ হয়ে উঠুক গুনাহ থেকে নিজেকে হানকা অনুভব করার আনন্দের উৎসব। এবারের ঈদ হোক জীবনের সেরা ঈদ।

পবিত্র রমাদান এবং আনন্দের এই মহান অনুষ্ঠান ঈদকে ধিরেই এবারে আমাদের আয়োজন- ‘ঘোন্মো রমাদান ও ঈদ সংখ্যা’। আল্লাহ আমাদেরকে রমাদানের সকল সাওম ইহসানের সাথে পান্নন করে ঈদ পর্যন্ত পৌছে দিন। আমিন।

- টিম ঘোন্মো

যা যা থাকচে:

- রমাদানের বার্তা
- দীপুর হিসেব
- সুখ খুঁজি
- অভ্যাস-আসক্তি
- ফিরবে কবে বলো
- মুভি সিনেমার ধূমজাল
- সিয়ামঃ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার-এক আধ্যাত্মিক রূপ
- আলোর পথের সহজ সমীকরণ
- ভ্যাক্সিন সমাচার
- সৈদ
- খুলি মেঘের ভাঁজ
- একটা মজার হাদিস বলি
- প্রোডাক্টিভ রমাদান
- তাঁর কালামের মায়ায়
- কথার লাগাম টানো
- রমাদানঃ যে মাস বিজয়ের মাস
- মহিমান্বিত রঞ্জনী
- পড়তে পারো
- অল্প সময়ে অধিক প্রিয় হবার উপায়
- খোশ-রোজ রমাদান
- হিফযুল কুরআন: একটি অবহেলিত সুন্নাহ
- চলো সময়কে কাজে লাগাই
- প্রথম ও শেষ রমাদান
- হারানো অনুভূতি
- দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে খুশির সৈদ
- শব্দখেলা

রমাদানের বার্তা

কামরূণনাহার মীম

বস্ত! শুনলেই কেমন এক অজানা ভালোলাগার অনুভূতি কাজ করে, তাইনা? জানো, মুমিনের জীবনেও বস্ত আসে। অবাক হলে? সত্যি বলছি, সেই বস্তের আশাতেই প্রহর গুণে মুমিন প্রতিটি বছর। মুমিনের জন্য সেই প্রতীক্ষিত বস্ত হচ্ছে ‘রমাদান’- যে মাসের বরকত পাওয়ার আশায় প্রহর গুণে মুমিন বান্দা। রমাদান হলো তাকওয়ায় নিজেকে মুড়িয়ে নেওয়ার এক মাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা রমাদানের আয়োজন, ঈদের কেনাকাটা নিয়ে যতটা ব্যস্ত থাকি, ততটা ব্যস্ত রমাদানের ইবাদত নিয়ে থাকি না।

নিজেকে একবার প্রশ্ন করো তো তুমি, এই মাসকে ঘিরে কেমন প্রস্তুতি তোমার। উত্তর পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা রোজার দিনে ইফতারের আইটেম নিয়ে চিন্তিত থাকি, রমাদান কোনোমতে কাটিয়ে দিয়ে ঈদের দিনের আহার আর আনন্দের পরিকল্পনা নিয়ে মেতে থাকি। শপিং নিয়েও চলে নানান পরিকল্পনা। ইফতারে বেগুনি, পেঁয়াজু, ডিম চপসহ সব আইটেম সামনে থাকা যেন বাধ্যতামূলক। রোজা থাকি আর না থাকি এসব আমদের খেতেই হবে। পুরো দিনটা জুড়ে হয়তো সালাত নেই অথচ নামমাত্র সাওম পালন করে কিভাবে আমরা রমাদান মাস কাটিয়ে দিই! তুমি জানো, রমাদান আসার অপেক্ষায় সালাফেরা কত মুখিয়ে থাকতেন? রমাদানের নেকি হাসিল করতে প্রতিযোগিতা করতেন তাঁরা? অথচ আমরা কি-না আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিচ্ছি! রমাদান সত্যিই কোনো হেলায় কাটিয়ে দেওয়ার মাস না। এ মাস গুনাহ মাফের প্রতিযোগিতায় পাল্লা দেওয়ার মাস। রমাদান ও অন্যান্য সাধারণ মাস গুলোর মতন হলে কেন আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়াতাআল্লাহ নির্দিষ্ট করে এই মাসকে বিশেষ বরকতময় বলেছেন-

তাৰো তো! কেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন যে, ‘নবীজি রমাদানের শেষ দশকে যত মেহনত করতেন তা অন্য কোনো মাসে করতেন না।’[১]

তোমাকে রোজার পূর্ণ সংজ্ঞা জানতে হবে। কেবলমাত্র পানাহার থেকে বিরত থাকা উপস হলেও এর সাথে রোজার ভিন্নতা রয়েছে। রমাদান সংযমের মাস, তাকওয়া অর্জনের মাস-স্বেফ আহার থেকে বিরত থাকলেই কি রোজা পূর্ণতা পায়, বলো? যে সিয়াম সাধনার মাসে এক ওয়াক্ত নামাজ নেই, কুরআনের স্পর্শ নেই, দান-সাদাকার তোয়াক্তা নেই, হকু আদায়ের কোনো চিন্তা নেই- তা আদৌ সাওম হয়? যথাযথভাবে সাওম পালন করলে তবেই তুমি আল্লাহর দেয়া প্রতিদান পাবে।

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয়ই রোজা আমার জন্য, আর এর প্রতিদান স্বয়ং আমিই দিব।’[২]

রমাদানের দিনগুলোতে সালাফের কথা হতো কুরআনের সাথে। সময় কাটতো যিকিরের সাথে। মসজিদের আঙিনায়। আলো ও প্রশান্তির পরিবেশে। ইবনু আব্দিল হাকাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ রমাদান মাস আসলে হাদীস অধ্যয়ন (হাদীসের নিয়মতাত্ত্বিক একাডেমিক ক্লাস) ও আহলে ইলমের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে বিরত থাকতেন, শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াতে অখণ্ড মনোনিবেশ করতেন।’[৩]

আচ্ছা, তুমি শেষ কবে কুরআন পড়েছিলে? কবে শেষ তোমার সাথে কথা হয়েছিলো কুরআনের? তুমি কিজানো? কুরআন পরকালে তোমার জন্য সুপরিশ করবে? তার জন্য তো তোমাকেও কুরআনের হকু আদায় করতে হবে। তাই না? দুনিয়ার শত ডিগ্রি অর্জনের

নেশায় কুরআনকে অনুধাবন তো দূরের থাক; পড়াটাই হয়ে ওঠে না। তোমাকে আল্লাহ কেন পাঠিয়েছেন, কি করতে হবে, কি করলে সেই সুন্দর জাগ্নাতের বাগান অবধি পৌঁছাতে পারবে তা জানতে চাওনা তুমি? তুমি কিন্তু রুটিন করে পড়া শুরু করলেই এগুলো জানা সম্ভব। তোমার দেরি না করে এখনই চেষ্টায় লেগে যাওয়া উচিত। এই রমাদান থেকেই শুরু করো। আজ থেকে তুমি প্রহর গুণবে রমাদানের। রুটিন মাফিক রমাদানকে করবে একদম প্রোডাক্টিভ। তোমার এ মাস জুড়ে থাকবে কুরআন, সালাত, সাওম। আর তোমার সাধ্যমতো সাদাকা করতে ভুলো না। পরিমাণে অঙ্গ হলেও দান করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তোমাকে টাকার সংখ্যা দিয়ে বিচার করবেন না, ইনশাআল্লাহ। তিনি বিচার করবেন তাকওয়া ও নিয়তের ভিত্তিতে।

রমাদানে কিন্তু এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি রাত রয়েছে, লাইলাতুল-কদর। এই রাত এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।^[৪] এই রাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পেছনের সকল গুনাহকে মাফ করে দিবেন।^[৫]

ইশশ! কম্পিউটারের ডিলিট অপশন দেখতে দেখতে মাঝে মধ্যে মনে হয় আমার গুনাহ কেও যদি এভাবে ডিলিট করা যেত! এত গুনাহের ভারে নুইয়ে যাওয়া বান্দাদের কী এই সুন্দর সুযোগ মিস করা উচিত বলো? এই সুযোগ হারানো যাবে না। আমাদের সকলকে আল্লাহ লাইলাতুল কুদর, ইবাদাতে কাটানোর তাওফিক দিন, আমিন। আল্লাহ আমাদের কবুল করে নিন।

শেষ করছি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহ-র বর্ণিত একটি হাদিস দিয়ে। তিনি বর্ণনা করেন: নবীজি ﷺ একবার মিশারে উঠলেন। এরপর তিনবার আমিন বললেন। প্রশ্ন করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যখন উঠছিলেন তখন তিনবার আমিন বললেন যে?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘জীবরীল আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে বললেন, যে ব্যক্তি রমাদান মাস পেল আর তার গুনাহ ক্ষমা করা হলো না সে জাহানামে যাক, আল্লাহ তাকে নিজ রহমত থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন, (হে নবি!) আপনি বলুন, আমিন। অতঃপর আমি আমিন বললাম।’^[৬]

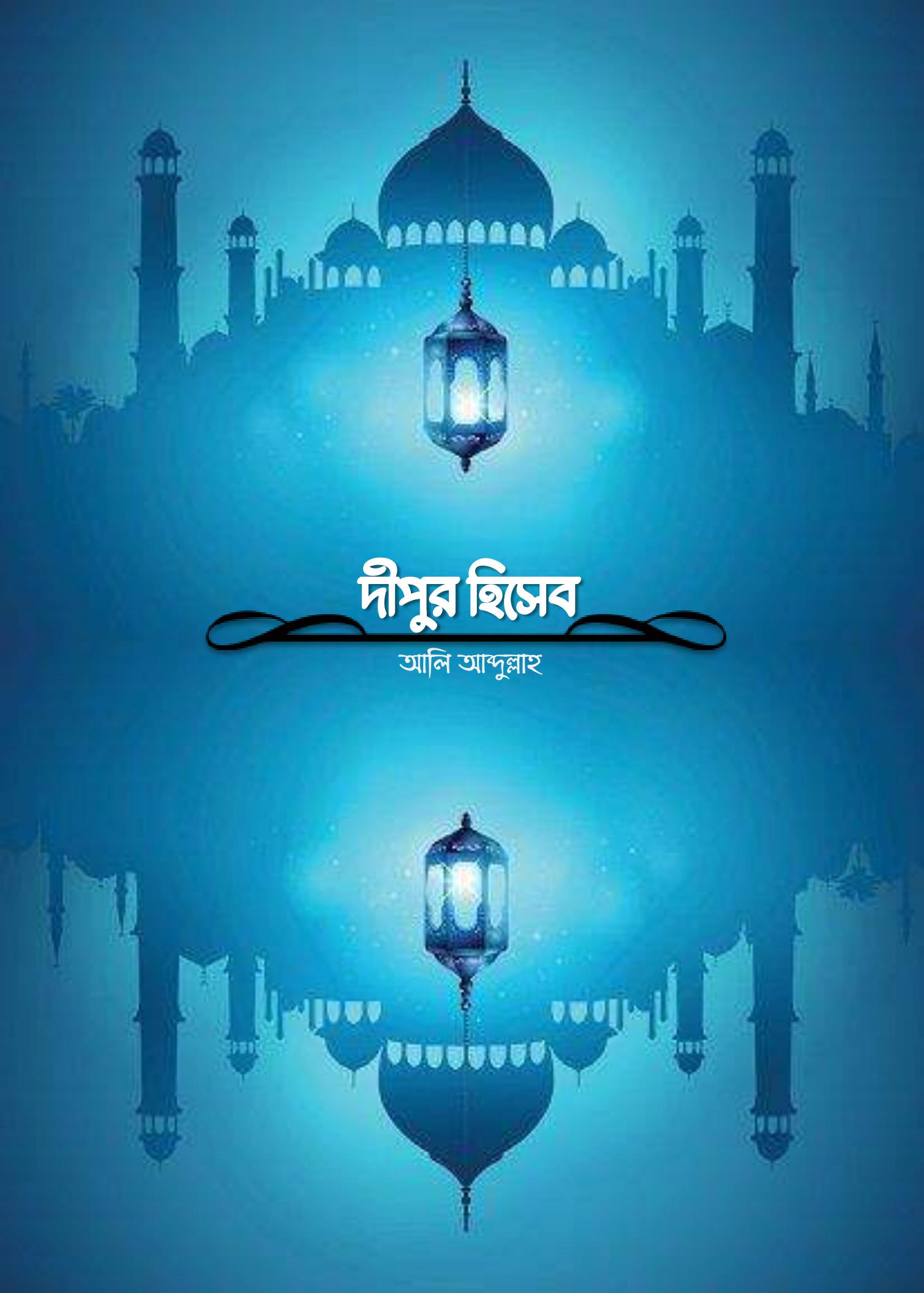
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، فقال: «آمين آمين آمين» قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت: آمين آمين آمين، قال: «إن جبريل أتاني، فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين،

আল্লাহ আমাদেরকে এমন দুর্ভাগ্যাদের লিস্টে না রাখুক।

**তোমাকে রোজার
পূর্ণ সংজ্ঞা
জাগতে হবো
ক্রিবলমাত্র
পানাহর থেকে
বিরত থাকা উপজ
হলেও এর মাথে
রোজার ভিন্নতা
রয়েছে। রমাদান
সংযমের মাম,
তাকওয়া
অর্জনের মাম-
স্বেফ আহার
থেকে বিরত
থাকলেই কি
রোজা পূর্ণতা পায়,
বলো?**

তথ্যসূত্র:

- [১] সহীহ মুসলিম(১১৭৫)
- [২] সহীহ বুখারী (৭৪৯২), সহীহ মুসলিম (১১৫১)
- [৩] লাতায়িফুল মাআ'রিফ ফীমা লি-মাওয়াসিমিল
‘আমি মিনাল ওয়ায়াইফ; ইবনে রজব হাস্বলী পৃ ১৭১
- [৪] সুরা কদর(৩)
- [৫] সহীহ বুখারী (৩৭)
- [৬] সহীহ ইবনে হিব্রান(৯০৭)



দীপুর হিমেব

আলি আব্দুল্লাহ

দীপু বসে আছে শহিদুল সাহেবের অফিস ঘরে। এক কামারার অফিস। অফিসের মাঝখানে বিশাল আকৃতির টেবিল পাতা রয়েছে। যার এক পাশে বসে আছে দীপু, অন্য পাশে শহিদুল সাহেব। টেবিলের ওপর শহিদুল সাহেবের ব্যবসার বেশ কিছু টাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তিনি সেই টাকাগুলো সাজিয়ে নিয়ে গুণতে শুরু করেছেন। দীপুর দিকে একবারও চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। অপেক্ষা করছে দীপু। শহিদুল সাহেব একবার চোখ তুলে তাকালেই কথা বলা শুরু করতে পারে সে। সমস্যা হলো কথার শুরুটা কিভাবে করবে, দীপু ঠিক বুঝতে পারছে না। সে কেন এসেছে, সেই বিষয়টা উপস্থাপন করতে যেই পরিমাণ সাহস তার প্রয়োজন সেটা এখনও বুকে ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। জীবনে প্রথম এমন অপরিচিত কারও কাছে টাকা চাইতে এসেছে সে। তিক্ষ্ণা কিংবা সাহায্য নয়, খণ্ড চাইবে।

বাবার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দীপুকে কখনও এভাবে টাকার জন্যে অন্যের কাছে ছোঁটা ছুটি করতে হয়নি। সুখের সংসার ছিল দীপুদের। বাবা-মা আর দীপু মিলে ছেউ সুখের সংসার। বাবা মারা যাওয়ার পর সব এলোমেলো হয়ে গেছে। মা এখন খুব অসুস্থ। দীপু মাত্র এসএসসি পাশ করেছে। ঘরে কামাই রোজগার করার কোনো মানুষ নেই। বাবার জমানো কিছু টাকা ছিল। তার মৃত্যুর পর, সেই টাকা ভেঙেই চলেছে দীপুদের সংসার। এরপর আত্মীয় স্বজনরা কিছুদিন সাহায্য সহযোগিতা করেছে। ইদানীং আত্মীয়রা আর সাহায্য করার আগ্রহ পাচ্ছে না। আজ সকালে মায়ের ওষুধ শেষ হয়ে গেছে। দু-বেলা খাবার যোগাড় করা যে সংসারে কঠিন কাজ সেখানে ওষুধ কেনা এক রকম বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু মায়ের শরীরের যে অবস্থা, তাতে ওষুধ না দেয়া হলে আঙ্গুহাত না করুক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা দীপুর। তাই মাকে কিছু না বলে, ওষুধ কেনার টাকা জোগাড় করতে বেরিয়ে পরেছে দীপু। প্রথমে গিয়েছিল বড় চাচার বাসায়। এর আগে কয়েকবার অল্প কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বড় চাচা। এবার দীপুর কথা শুনে মুখ গভীর করে বললেন:

এলোপ্যাথি ওষুধ তো আসলে ওষুধ না। ওগুলো বিষ। আমি নিজেও আগে এক গাদা ওষুধ খেতাম। এখন বেশির ভাগই ছেড়ে দিয়েছি। ইদানীং আমি ভেষজ ট্রিটমেন্ট নিছি। বুঝলি দীপু, আসল ওষুধ হলো ভেষজ ওষুধ। তোর মাকে এলোপ্যাথি না খাইয়ে, বরং ভেষজ খাবার খাওয়া। বুকে ব্যাথার জন্যে পাথর চুনা পাতা লবণ দিয়ে খেতে বল। জাদুর মতো কাজ করবে। গলায় কফ জমলে তুলসী পাতা পেস্ট করে, সেই পেস্ট খাইয়ে দিবি। সব ঠিক হয়ে যাবে বুঝলি। ডায়াবেটিস অতিরিক্ত বেড়ে গেলে খাওয়াবি নিম পাতার রস এক চামচ করে। ব্যাস, দেখবি ডায়াবেটিস পেছনের দরজা দিয়ে পালাবে। আমার ছাঁদে পাথর চুনা পাতা আর তুলসী পাতা দুটোই হয়েছে। ছাদে গিয়ে প্রয়োজন মতো ছিঁড়ে নিয়ে যা। পাশের বাসার উঠানে একটা বড় নিম গাছ আছে। সেখান থেকে নিম পাতা নিয়ে যেতে পারিস।

বড় চাচা কী বলতে চাইছেন, সহজেই বুঝালো দীপু। সে ছাদে গিয়ে পাথর চুনা পাতা কিংবা তুলসী পাতা আনল না। মাথা নিচু করে বের হয়ে এলো বড় চাচার বাড়ি থেকে। এরপর গেল একমাত্র মামার বাসায়। মামার কাছে টাকা চাইতেই, তিনি ক্রুঁচকে বলল,

-তোর চাচার কাছে গিয়েছিলি?

-দীপু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

-কী বললেন তিনি?

-কিছু বললি।

-টাকা দেয়ানি তোকে?

দীপু চুপ করে রইলো। মামা কর্তৃপক্ষের উঁচিয়ে বলল,

-এ কেমন কথা। তোর চাচার তো একটা দ্বায়িত্ব আছে না-কি। নিজের ছোট ভাইয়ের সংসারকে সে এভাবে অবহেলায় ফেলে রাখতে পারে না। তুই এখনি তার কাছে আবার যাবি। এবং জোর গলায় তোর দাবি জানাবি। এখনি চলে যা। দেরি করিস না।

দীপু দেরি করলো না। দ্রুত বেরিয়ে এলো মামার বাসা থেকে। মনটা ভীষণ খারাপ করছিলো দীপুর। ঠিক সেই

মুহূর্তে তার মনে পড়লো শহিদুল সাহেবের কথা। বাবার এক মাত্র বন্ধু যিনি বাবাকে ধরে ধরে মাসজিদে নিয়ে যেতেন। বাবার থেকে বয়সে অনেক বড় হলেও বাবার সাথে বেশ স্বচ্ছ ছিল শহিদুল সাহেবের। বড় একজন ব্যবসায়ী তিনি। দীপু দু-একবার বাবার সাথে শহিদুল সাহেবের অফিসে এসেছিলো। শহিদুল সাহেবের অফিসে এলেই দীপুর হাতে সৌদি থেকে আনানো কাঁচা খেজুর তুলে দিতেন শহিদুল সাহেব। দীপু বেশ মজা নিয়ে থেতো। আজকে যখন দীপু তার মামা-চাচার কাছ থেকে মায়ের ওষুধের টাকা জোগাড় করতে ব্যর্থ হলো, তখনই কী মনে করে ছুটে এলো শহিদুল সাহেবের অফিসে। এরপর থেকেই দীপু তার সামনে বসে আছে। শহিদুল সাহেব বেশ কিছুক্ষণ পর দীপুর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে অমায়িক হাসি দিলেন। হাসির উত্তরে হাসি উপহার দিতে হয়। এটাই নিয়ম। দীপুর এখন মোটেই হাসিমুখ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। তারপরও নিয়ম রক্ষার্থে সে খানিকটা হাসার চেষ্টা করলো। শহিদুল সাহেব বললেন:

-কিছু মনে করো না। তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না বাবা।

-আমি দীপু। আপনার বন্ধু রহমত সাহেবের ছেলে আমি।

-ওহ আচ্ছা। রহমত ভাইয়ের ছেলে তুমি।

-জি

খুব ভালো মানুষ ছিলেন তোমার বাবা। নিয়মিত নামাজ পড়া শুরু করেছিলেন। তাওবা করে ফিরে এসেছিলেন দীনে। আঙ্গুহাত ওনাকে করুল করুন। তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, দুঃখিত।

দীপু লজিত গলায় বলল, অসুবিধা নাই।

শহিদুল সাহেবের মুখের হাসি প্রশংসন করে বললেন, টাকা পয়সা গণনার ম্বেত্রে আমি বেশ কাঁচা মানুষ

বুবলে দীপু। এই দেখোনা কত টাকা এখনও এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। ভেবেছিলাম সব টাকা গুছিয়ে, গুণে শেষ করে তারপর তোমার সাথে কথা শুরু করবো। এখন বুঝতে পারছি সেটা সম্ভব হবে না।

দীপু বিনয়ের সাথে বলল,

-আপনি কাজ শেষ করেন আমি পরে আসব।
-না না বসো তুমি। আমি পরে গুণে নেব সমস্যা নেই।
বলেই টাকাগুলোকে একসাথে করে একটা পেপার ওয়েট দিয়ে চাপ দিয়ে রাখলেন শহিদুল সাহেব।
হাসিমুখে বললেন,
-এখন বলো কী জন্যে এসেছো?
-আপনাকে দেখতে এসেছি।

কথাটা বলেই রাগে দীপুর গা জ্বলে উঠলো। সে এসেছে টাকা চাইতে। ভগিতা না করে সরাসরি চেয়ে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ধার চাইতে এসেছে সে, ভিক্ষা নয়। সুতরাং তার এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তারপরও অঙ্গুত ব্যাপার হচ্ছে, মুখ ফুটে টাকার কথা বলতে পারছে না দীপু। তার মাথা ঘূরাচ্ছে।

তবে শহিদুল সাহেব দীপুর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হলো না। বরং দীপুর কথা শুনে তার চেখ চক চক করতে শুরু করেছে। তিনি আদুরে গলায় বললেন, বাহ! যেমন বাবা, তেমনই তার ছেলে। তোমার বাবাও কিন্তু আমাকে দেখতে হট হাট আমার কাছে চলে আসতেন। বিশেষ করে গত রমাদানে প্রতিদিনই আমি আর তোমার বাবা একসাথে হয়ে অনেক গল্প করেছি।

দীপু কৌতুহলী হয়ে জিজেস

করে:
কী গল্প করতেন বাবা আপনার সাথে ?

-সে অনেক গল্প। রমাদানে সব রমাদান বিষয়ক গল্প হতো। রোজা রাখার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হতো।

দীপু গভীর গলায় বলল, বাবা গত বছরই প্রথম রমজান মাসে রোজা রাখা শুরু করেছিলেন।
হ্যাঁ। তোমার বাবা নাস্তিকতা থেকে দ্বিনের ফিরে আসার পর সেটাই ছিল তার জীবনের প্রথম রমাদান। এবং তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে সব গুলো রোজা রেখেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ।

দীপু মাথা নিচু করে বলল, আমাকেও বাবা গতবার অনেক অনুরোধ করেছিলেন রোজা রাখতে। আমি রাখিনি।

-তুমি কী আল্লাহকে বিশ্বাস করো দীপু?
-হ্ম। বিশ্বাস করি। বাবা যখন অবিশ্বাসী ছিলেন,

তখনও আমি আর মা আল্লাহকে বিশ্বাস করতাম। এখনও করি।

-তাহলে রোজা কেন রাখোনি?

-খিদে লেগে যায়। অভ্যাস নেই।

শহিদুল সাহেবের মুখে এতক্ষণ প্রশংস্ত হাসি ছিল। সেই হাসি একটু মিহিয়ে গেছে। তিনি গভীর মুখ করে বললেন, দেখো দীপু, আল্লাহ ঈমানদারদের জন্যে রমাদান মাসের রোজা ফরজ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।'(১)

এই আয়াতে আল্লাহ আমাদের বলেছেন যে ঈমানদারদের জন্যে রোজা রাখা ফরজ। তোমাকে মজার একটা তথ্য দিই দীপু। এই আয়াতের দিকে লক্ষ করো- রোজা যে কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের উপরই ফরজ করা হয়েছে

বিষয়টা এমন নয়। পূর্ববর্তী নবীগন এবং তাদের উম্মতের উপরেও রোজা ফরজ ছিল। রোজার মূল উদ্দেশ্য কী বলতে পারবে?

-জি না।

রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। ইসলামের যে পাঁচটি ভিত্তি আছে। রোজা তার মধ্যে অন্যতম। সহিহ বুখারি আর মুসলিমের একটা হাদিসে বলা হয়েছে,

'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ক. এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। খ. সালাত কায়েম করা। গ. যাকাত আদায় করা। ঘ. হজ্জ পালন করা এবং ঙ. রমাদানের রোজা রাখা।'(২)
তুমি কী আমার কথা শুনছো দীপু?

দীপু মাথা নিচু করে বসে ছিলো। এবার মাথা উঁচিয়ে হেসে বলল, জি শুনছি।

শহিদুল সাহেব বললেন, এ বছরের রমাদান মাসও তো চলে এলো বলে। আগে কী করেছো সেটা ভুলে যাও। এবারের রমাদান থেকে রোজা রাখা শুরু করে দিও কেমন।

চাচা। বাবা আগে রোজা রাখতেন না একদম। তাই আমিও রাখতাম না। এখন একদম অভ্যাস চলে গেছে রোজা রাখার। আর তাছাড়া, আমি তো অনেক গুনাহ করি। এরকম গুনাহগার হয়ে রোজা রেখে কী লাভ।

শয়তানকে সুযোগ দিও না দীপু। সে তোমাকে বাজে লজিক দিয়ে রোজা থেকে বিরত রাখতে চাইবে। শয়তানের কথায় ভুল করবে না। বরং তুমি যদি গুনাহগার হও তোমার উচিত রমাদান মাসের রোজার সাথে পরবর্তী নফল রোজাও রাখ। রোজা কিন্তু গুনাহ মাফের একটি মাধ্যম।

রমাদান মাসের রোজা এতটা মহিমাপূর্ণ একটি আমল, যার মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলামীন বান্দার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবশাদ করেন,
'যে ব্যক্তি ঈমান এবং ইহতিসাব তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং সওয়াবের প্রত্যাশা রেখে রমাদান মাসে রোজা রাখবে, তার পূর্বের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে।'^(৩)

দীপু বুঝতে পারছে, এই বৃদ্ধ তাকে পেঁচিয়ে ফেলছে। বৃদ্ধের কথায় অড়ুত এক আর্কর্ণ আছে। তার কথা শুনতে নেশার মতো হয়ে যায়। ভালো লাগে। তবে বৃদ্ধের কথার প্যাচ আরেকটু শক্ত হলে, এখান থেকে উঠে বের হওয়াই মুশকিল হবে। মুখ ফুটে মায়ের ওষুধের জন্যে টাকার কথাটা আর বলা হবে না। যা বলার এখনই বলতে হবে তাকে।

দীপু ইতস্তত করে বলল, চাচা একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

শহিদুল সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দীপুর দিকে। দীপুর প্রশংশ শোনার আগ্রহ তার মধ্যে বেশ কাজ করছে।

দীপু বলল, চাচা যারা নিদারূণ অর্থ কষ্টে ভুগছে, এমন মানুষদের জন্যেও কি রোজা ফরজ?

শহিদুল সাহেব ডান হাত দিয়ে টেবিলে হালকা চাপর দিয়ে বলল, আলবৎ। তাদের জন্যেও রোজা ফরজ। আরে ব্যাটা, রোজার প্রতিদান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে স্বয়ং নিজে দেবেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে,

'আল্লাহ তাআলা বলেন, সকল আমলের সওয়াব তো (এক রকম) নির্ধারিত। অর্থাৎ প্রতিটি নেকি দশ থেকে সাতশ শুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তবে রোজার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা রোজা একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। আর তাই এর প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দেবেন।'^(৪)

দীপু ত্রু কুঞ্জিত করে জিজেস করলো,
স্বয়ং আল্লাহ পুরক্ষার দেবেন ভালো কথা। কিন্তু
পুরক্ষারটা কী?

আল্লাহ কেমন প্রতিদান দেবেন তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন দীপু। আমরা শুধু বুঝি, যে প্রতিদান আল্লাহ বিশেষভাবে দেবেন তা তাঁর শান মোতাবেক দেবেন। রোজার ক্ষেত্রে বান্দার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে এত বড় সম্মান ও পুরক্ষার এ জন্য যে, রোজা সাধারণত

আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। অন্যান্য আমলের তুলনায় রোজার ক্ষেত্রে রিয়ার আশঙ্কাও কম থাকে। সেজন্যই আল্লাহ বলেছেন, রোজা আমার জন্য। আর এজন্যই আল্লাহ নিজে রোজার প্রতিদান দিবেন। মজার ব্যাপার হলো রোজা কিন্তু তোমার ঢাল হিসেবেও কাজ করবে। মুমিনের রোজা তার জন্য ঢাল হবে। অর্থাৎ ঢাল যেভাবে মানুষকে রক্ষা করে তেমনি রোজাও রোজাদারকে রক্ষা করবে। তাকওয়া হাতিলের প্রতিবন্ধকতা থেকে, গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে, প্রবৃত্তি অবদমিত করার ক্ষেত্রে, কবরে-হাশরে এবং আখেরাতের সকল ঘাঁটিতে, এমনকি জাহানামের ভয়াবহ আগুন থেকে রোজা আল্লাহর ইচ্ছাতে একজন রোজাদারকে রক্ষা করবে।

হাদিসে এসেছে-

'রোজা ঢাল স্বরূপ, যতক্ষণ না তা বিদীর্ণ করে ফেলা হয়।' জিজ্ঞাসা করা হলো, কীভাবে তা বিদীর্ণ হয়?
নবীজি বললেন,
'মিথ্যা অথবা গীবতের মাধ্যমে।'^(৫)

দীপু শহিদুল সাহেবকে থামিয়ে দিয়ে কিছু একটা বলতে চাইছিল। শহিদুল সাহেব হাত ইশারায় দীপুকে চুপ করতে বললেন। এরপর এক ফ্লাস পানি বিসমিল্লাহ বলে গলায় চালিয়ে দিয়ে, রোজা বিষয়ে বিশেষ এক লেকচার শুরু করে দিলেন। দীপু বুঝতে পারলো, তার কিছুই করার নেই, সে যেই পেঁচিয়ে পড়ার ভয় করছিলো সেই প্যাঁচ লেগে গেছে। সে শহিদুল সাহেবের কথার প্যাঁচে আটকে গেছে। তবে আজব ব্যাপার হলো পুরো লেকচারটা শুনতে দীপুর একটুও খারাপ লাগেনি। বরং ভালো লাগছিলো। মাঝে মাঝে হ্ট করে তার মনে হচ্ছিলো শহিদুল সাহেবের জায়গায় বাবা বসে আছেন। ব্যাপারটা বেশ অড়ুত লেগেছে তার কাছে। শহিদুল সাহেব তার বিশাল লেকচারে রোজার বিষয়ে বেশ কিছু ইনফরমেশন দিয়েছেন। যা দীপুর কাছে একদম নতুন লেগেছে। সেগুলোর একটা লিস্ট দীপু মনে মনে করে ফেলেছে। সেগুলো হলো:

রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধি আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক প্রিয়ঃ রোজাদার ব্যক্তি দিনভর উপোস থাকে। অনাহারে থাকার দরুণ তার মুখে একধরনের দুর্গন্ধি সৃষ্টি হয়। দুনিয়াবী বিবেচনায় তা দুর্গন্ধি মনে হলেও আল্লাহর কাছে সেটা মেশকের চাইতেও অধিক প্রিয়। নবীজী ﷺবলেন: 'ঐ স্বত্তর কসম, যার কজায় মুহাম্মাদ এর প্রাণ, রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধি আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিময়।'^(৬)

রোজাদারের জন্য বিশেষ আনন্দের মুহূর্তঃ রোজাদারের জন্য দুটি বিশেষ আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি হলো, ইফতারের সময়। অপরটি হলো, যখন সে তার বেবের সাথে সাক্ষাৎ করবে (আর তিনি তাকে বিশাল পুরক্ষার ও সম্মানে ভূষিত করবেন)।^(৭) রোজাদার দিনভর আল্লাহর হৃকুমে উপবাস থাকার পর যখন আল্লাহর হৃকুম মোতাবেক ইফতারি নিয়ে বসে তখন তার মনে অন্যরকম আনন্দ এবং অগার্থিব প্রশান্তির এক চেট

দীপু বুঝতে পারলো, তার কিছুই করার নেই, সে যেই পেঁচিয়ে পড়ার ভয় করছিলো সেই প্র্যাং লেগে গেছে। সে শহিদুল সাহেবের কথার প্র্যাং আটকে গেছে। তবে আজব ব্যাপার হলো পুরো লেকচারটা শুনতে দীপুর একটুও খারাপ লাগেনি। বরং ভালো লাগছিলো।

খেলে যায়। আর কিয়ামতের ময়দানে যখন সে রবের নিকট থেকে রোজার প্রতিদান গ্রহণ করবে ঐ মুহূর্তটিও তার জন্য হবে অবারিত আনন্দের।

রোজাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় নাঃ রোজাদার ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট এতটাই মহবতের পাত্র যে, সে কিছু চাইলে আল্লাহ পাক তা ফিরিয়ে দেন না। নবীজী বলেন, তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। এক রোজাদারের দুআ ইফতারের মুহূর্ত পর্যন্ত। দুই ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ। তিনি মজলুমের দুআ। আল্লাহ এ দুআকে মেঘমালার উপরে নিয়ে যান। এর জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেন। রব বলেন, আমার ইজজতের কসম, বিলম্বে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব।^(১)

রোজাদারের জন্য রোজা সুপারিশ করবেং কিয়ামতের দিন রোজাদারের জন্য রোজা নিজে সুপারিশ করবে। হাদিসে এসেছে, ‘কিয়ামতের দিন সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, ওগো রব! দিবসে আমি তাকে পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে নিবৃত্ত রেখেছি। তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ করুন। আর কুরআন বলবে, রাতে আমি তাকে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ করুন। অতঃপর তাদের সুপারিশ করুন করা হবে।’^(২)

রোজাদারের জন্য জালাতে প্রবেশের বিশেষ দরজা থাকবেং রোজাদার হলেন আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহমান। নবীজী বলেন, ‘জালাতে একটি দরজা রয়েছে। নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন তা দিয়ে রোজাদাররা প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে, রোজাদাররা কোথায়? তখন তারা আসবে। তারা ছাড়া তা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না। রোজাদাররা প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আর কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।’^(৩)

শহিদুল সাহেব আল্লাহর পক্ষ থেকে রোজার প্রতিদান গুলো এত আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করছিলেন, দীপুর মনে হচ্ছিলো, রোজা রাখা শুরু করলেই দুনিয়াতে তার সব সমস্যা গুলো সমাধান হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহই তার সমস্যা সমাধান করে দেবেন। দীপুর চোখে ঘোড় লেগে আছে। শহিদুল সাহেবের কথা তার চোখে ঘোর তৈরি

করেছে। শহিদুল সাহেবও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। তিনিও কথা বলে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। তিনি খানিক নড়েচড়ে বসে আবার কথা শুরু করলেন।

দীপু কথা শুনতে খারাপ লাগছে ?

-জি না।

গুড়। শোন রমাদানে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়। রমাদান মাস কুরআন নায়িলের মাস। আল্লাহ তাআলা কুরআন নায়িল করেছেন এ মাসে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

রমাদান মাস, যে মাসে কুরআন নায়িল করা হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়েতের দিশারী, সৎপথের স্পষ্ট নির্দশন এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে।^(৪)

সুতরাং এই মাসে কুরআনের প্রতি বেশি মনোযোগী হতে হবে।

দীপু সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লো। শহিদুল সাহেব বললেন, ইটারেস্টিং একটা তথ্য দিই তোমাকে। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিবরীল আলাইহিস সালাম রমাদান মাসে সম্পূর্ণ কুরআন শোনাতেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম রমাদানে প্রতি রাতে নবীজীর নিকট আসতেন। তিনি নবীজিকে পুরো কুরআন শোনাতেন এবং নবীজিও তাকে কুরআনু কারীম শোনাতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের আগের রামদানে জিবরীল আলাইহিস সালাম দু-বার নবীজিকে কুরআন শুনিয়েছিলেন। একটি হাদিস আছে বুখারিতে এই ব্যাপারে।^(৫) আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো রমাদান মাসে আছে লাইলাতুল কদর। দীপু তুমি কী জানো লাইলাতুল কদর কী?

দীপু ঘাড় নেড়ে বলল, সুরা কদর আমার মুখ্য আছে। -অর্থ জানো?

দীপু না সূচক মাথা নাড়ল।

শহিদুল সাহেব বললেন, কদর রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই রজনীতে ফেরেশতাগণ ও রুহ অবতরণ করেন প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রমে। শাস্তি শাস্তি, সেই রজনী সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত।^(৬)

সুতরাং এই রাত রমাদানে খুঁজে নেয়া দরকার। এবং এই রাতে নামাজ, তাওবা-ইন্সিগ্নিয়ার, দুয়া-দুরাং বেশি বেশি করা দরকার। আর বিশেষ করে রমাদানের শেষ দশ রাতে ইবাদত বাড়িয়ে দেয়া দরকার।

দীপু ভ্রকুঞ্জিত করে বলল, এর কারণ কি?

এর কারণ হলো, হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী,

কদরের রাত সুনির্দিষ্ট নয়। তবে রমাদানের শেষ দশকে তা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদানের শেষ দশকে ইবাদতের মাত্রা ও পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। আম্মাজান হ্যারত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবীজির শেষ দশকের আমলের বিবরণ দিয়ে বলেন: ‘রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য দিনগুলোর তুলনায় রমাদানের শেষ দশকে বেশি ইবাদত করতেন।’^(১৪)

তিনি আরো বলেন, ‘রমাদানের শেষ দশক শুরু হলে নবীজি পূর্ণ রাত্রি জাগরণ করতেন। পরিবারের সবাইকে জাগিয়ে দিতেন এবং নিজে বেশি বেশি ইবাদাতের প্রস্তুতি নিতেন।’^(১৫)

রমাদানের শেষ দশ দিনে একটি বিশেষ ইবাদাত আছে, যাকে বলে ইতিকাফ। এই সম্পর্কে কী তোমার কোন ধারণা আছে।

শুনেছিলাম। মানুষজন মাসজিদে থাকে।

ঠিক শুনেছো। মাসজিদে শেষ দশ দিন থেকে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করার মজাই কিন্তু আলাদা। এবং এতে লাইলাতুল কদর মিস হওয়ার সম্ভাবনা একদম কমে যায়। রমাদানের ত্রিশ দিনের শেষ দশদিন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রমাদানের একটি বিশেষ আমল হচ্ছে সুন্নাত ইতিকাফ। রমাদানের খায়র-বরকত লাভে ইতিকাফের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নবীজি রমাদানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফ করায় বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এজন্য

রমাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা সুন্নতে মুয়াকাদাহ কিফায়াহ। নবীজী প্রতি বছর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে রমাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। আম্মাজান হ্যারত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্সিগ্নিয়ারের আগ পর্যন্ত রমাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। নবীজির পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করতেন।^(১৬)

হ্যারত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, জিবরিল প্রতি বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার কুরআন শোনাতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর দুই বার শোনান। নবীজি



প্রতি বছর দশ দিন ইতিকাফ করতেন। কিন্তু ইন্সিগ্নিয়ারের বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন।^(১৭)

কথার এ পর্যায়ে আজান হতে শুরু করলো। আসরের আযান পড়ে গেছে। শহিদুল সাহেব কথা থামালেন। দীপু ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে ছিল শহিদুল সাহেবের দিকে। সেই ঘোর এখন কাটতে শুরু করেছে। শহিদুল সাহেব হাসি মাখা মুখে বললেন, কিভাবে সময় যায় দেখেছো। কথা বলতে বলতে আসরের আজান হয়ে গেল। তোমাকে চা-পানি কিছুই সাধা হলো না।

-ওগুলো লাগবে না চাচা।

-অবশ্যই লাগবে। রহমত সাহেবের ছেলে আমার কাছে এসে একদম খালি মুখে যাবে সেটা হতে পারে না। তবে চলো আগে মাসজিদে গিয়ে নামাজটা আদায় করি, ফেরার পথে ভালো একটা রেস্টুরেন্টে বসে কিছু খেয়ে নেবো।

এই কথা বলেই শহিদুল সাহেব তার পাঞ্জাবির হাতা কাচাতে শুরু করলেন। ব্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন,

-তুমি একটু বসো আমি ওজু করে আসি। আমি আসলে তুমি ওজু করে নিও।

-জি আচ্ছা।

শহিদুল সাহেবের উঠে ওজু করতে গেলেন।

ঘরে এখন দীপু একা বসে আছে। ফ্যানের বাতাসে টেবিলে পেপার ওয়েট দিয়ে চেপে রাখা টাকা গুলো উড়ে যেতে চাঁচ্চে। একশ, পাঁচশ, হাজার টাকার অসংখ্য অগোছালো নোট। শহিদুল সাহেব এখনও হিসেব করে রাখেননি। দীপুর মনে শয়তান কু-মন্ত্রনা দিতে শুরু করলো। সে মনে মনে ভাবলো, এখান থেকে মায়ের ওয়ুধের টাকা-টা নিয়ে নিলে কেমন হয়? শহিদুল সাহেবের কাছে চাইলে তিনি হয়তো দু-একশ টাকা হাতে ধরিয়ে দেবেন। দীপুর দরকার দু-হাজার টাকা। এখান থেকে যদি সে দুই হাজার টাকা সরিয়ে ফেলে, শহিদুল সাহেব বুঝতেও পারবেন না। আল্লাহ তো শহিদুল সাহেবকে অনেক দিয়েছেন, সুতরাং তার থেকে

দু হাজার টাকা না বলে নিলে এমন কী হবে। মুখ ফুটে যখন সে টাকার কথা বলতেই পারছে না। সেহেতু না বলে নিয়ে গেলেই হয়। মা কে বাঁচাতে জীবনে না হয় প্রথম এবং শেষ বারের মতো চুরি করলো সে।

দীপুর নিঃশ্঵াস ঘন হয়ে আসছে। কী সব চিন্তা করছে সে। টাকাটা তার খুব দরকার। তাই বলে চুরি করবে। দীপু আরেক নজর পেপার ওয়েটের নিচে চাপা পরে থাকা টাকা গুলোর দিকে তাকায়। সময় হাতে একদম নেই। যা করার এখনই করতে হবে। শহিদুল সাহেবের ওজু শেষ করে যে কোনো সময় চলে আসবেন। দীপু হট করে পেপার ওয়েট তুলে এক হাজার টাকার দুটো নোট হাতে নিলো। এরপর সময় নষ্ট না করে বাড়ের গতিতে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। বাকি টাকা গুলো পেপার ওয়েটের ওজনের নিচে চাপা পরে রইলো আগের মতোই।

২

পরের দিন সকাল বেলা। শহিদুল সাহেবের তার অফিস ঘরে বসে আছেন একা। হাতে বিশাল মোটা এক বই। তিনি মনোযোগ দিয়ে বই এর পাতা ওলটাচ্ছেন। দীপু ধীর পায়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

শহিদুল সাহেবের বই থেকে মাথা না উঠিয়ে কর্কশ কঢ়ে জিজেস করলো, কী চাই ?

দীপুর মুখ থেকে কোনো কথা বের হচ্ছে না। সে খুব নীরবে এক হাজার টাকার দুটো নোট শহিদুল সাহেবের সামনে রাখলো।

শহিদুল সাহেবের আড় চোখে দীপুর দিকে তাকিয়ে জিজেস করলেন, কীসের টাকা?

দীপু শাস্ত গলায় বলল, গতকাল না বলে নিয়েছিলাম।

সেটা জানি আমি। ফেরত দিছ কেন?

দীপু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। কী বলবে সে?

শহিদুল সাহেব বেশ কিছুক্ষণ দীপুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মমতা জড়ানো গলায় বললেন,

-দীপু

-জি?

-টাকা চুরি করতে গেলে কেন?

দীপু মাথা নিচু করে রইলো। তার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। লজ্জায় মাথা উঠিয়ে কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেলেছে সে। তারপরও শত আড়ষ্ঠতা ভেঙে দীপু গতকালের ব্যাপারটা বলল।

শহিদুল সাহেব দীপুর কথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন। মোটা বইটা বন্ধ করে দীপুর দিকে তাকিয়ে জিজেস করলেন, মায়ের ওষুধের টাকা কী অন্য কোথাও থেকে জোগাড় হয়েছে?

-জি না।

-তাহলে টাকাটা ফেরত দিচ্ছো যে ?

চুরির টাকা হারাম। এই টাকা দিয়ে মায়ের ওষুধ কিনব না।

আমার কাছে না চেয়ে চুরি করতে গেলে কেন? চুরি করা অনেক বড় গুনাহের কাজ দীপু। তুমি যখন চুরি করছিলে তখন কেউ ছিল না কিন্তু আল্লাহ ছিলেন। তিনি কিন্তু দেখেছেন।

দীপু কোন কথা বলল না। চুপ করে রইলো। শহিদুল সাহেবের বললেন, আমি চাইলে কী তোমাকে দিতাম না? চাইতে কী লজ্জা লাগছিলো দীপু?

দীপু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। শহিদুল সাহেবের কথার উত্তর দেয়ার শক্তি তার নেই।

শহিদুল সাহেবের বললেন, দীপু। এই দু-হাজার টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এটা তোমার।

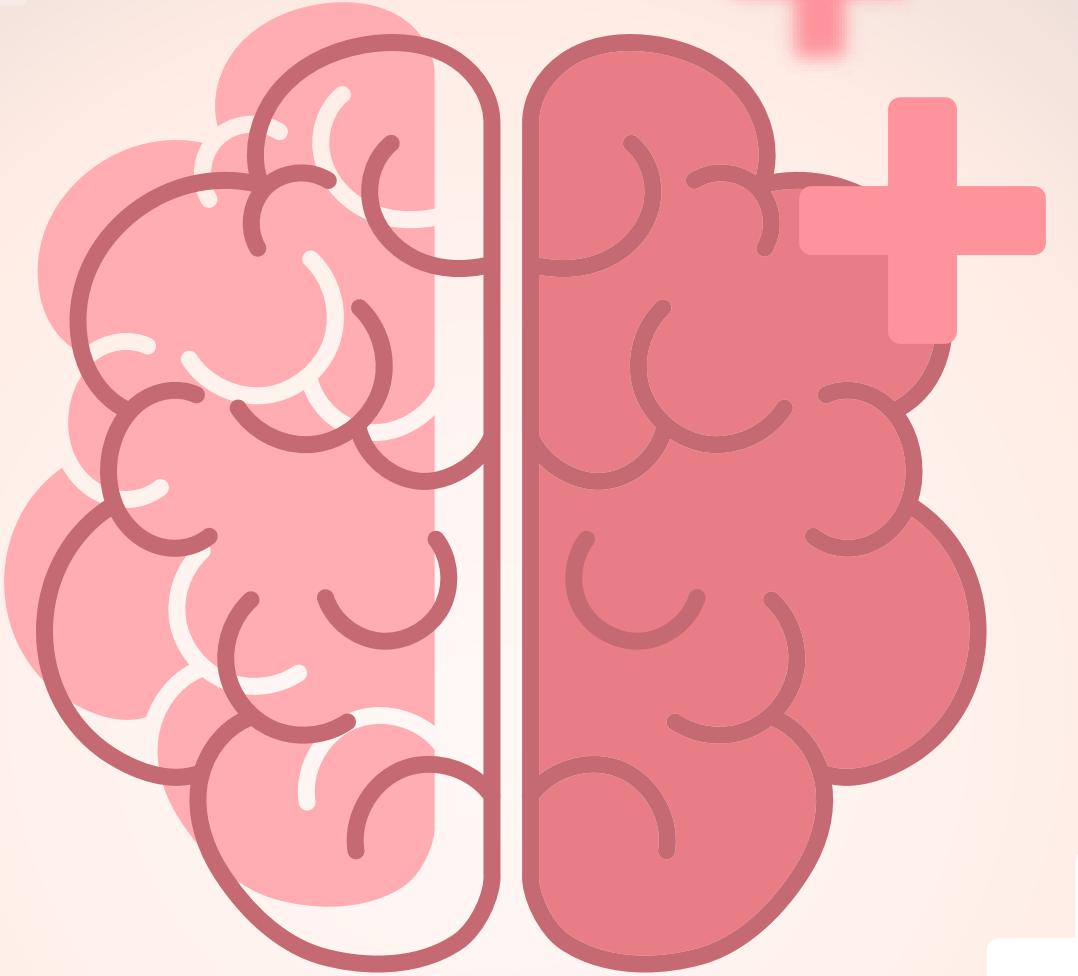
দীপু এবার বড় বড় চোখ করে তাকায় শহিদুল সাহেবের দিকে। শহিদুল সাহেবের হাসিমাখা মুখে বলেন, না না। এটা দান করছি না। তোমাকে এই টাকাটা আমি ধার দিচ্ছি। এবং এই ধার দেয়ার শর্ত হলো আমার দুই নাতিকে তুমি পড়াবে, এবার আমার সাথে রমাদানের শেষ দশ দিন মাসজিদে ইতিকাফে বসবে। এবং তোমার পড়ালেখার পাশাপাশি আমার ব্যবসাতে সময় দেবে। কী পারবে না?

দীপু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো, সে পারবে।

দীপুর চোখে আগেও পানি ছিল। লজ্জার, অপমান এবং গ্লানির পানি। এখন আবারও আরেকবার দীপুর চোখ ভিজে উঠেছে। এবার দীপুর চোখের পানির রঙ এক হলেও, এর স্বাদ ভিন্ন। চোখের এই পানি শ্রদ্ধার, ভালোবাসার অন্দকার থেকে আল্লাহর করণার দিকে ফিরে আসার স্বচ্ছ শুন্দ পানি।

তথ্যসূত্রঃ-

- [১]সূরা বাকারা (২ : ১৮৩)
- [২]সহীহ বুখারী (৮), সহীহ মুসলিম (১৬)
- [৩]সহীহ বুখারী (৩৮)
- [৪]সহীহ মুসলিম (১১৫১), সহীহ বুখারী(৫৯২৭)
- [৫] সুনানে নাসায়ী (২৩৩০), মুসনাদে আহমাদ (১৬২৭৮)
- [৬]সহীহ বুখারী(১৯০৮)
- [৭]সহীহ মুসলিম (১১৫১)
- [৮] জামে তিরমিয়ি (৩৫৯৮), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৭৫২), মুসনাদে আহমাদ (৯৭৪৩)
- [৯] আল-মুজামুল কাবীর; তাবারানী (১৪৬৭২), আরো দেখুন: মাজমাউয় যাওয়াইদ; হাইছামী (৫০৮১), (৩৩১০)
- [১০] সহীহ মুসলিম(১১৫২)
- [১১] সূরা বাকারা (২ : ১৮৫)
- [১২] সহীহ বুখারী (৪৯৯৮)
- [১৩] সূরা কদর (৯৭ : ৩-৫)
- [১৪] সহীহ মুসলিম(১১৭৫)
- [১৫] সহীহ মুসলিম (১১৭৪) সহীহ বুখারী (২০২৪)
- [১৬] সহীহ মুসলিম(১১৭২) সহীহ বুখারী(২০২৬)
- [১৭] সহীহ বুখারী(৪৯৯৮, ২০৪৪)



অভ্যাস-আসক্তিঃ চোরে চোরে মাস্ততো ভাই

- রিফাত জাহান রোমেল

মাস্ক লাগালে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। করোনার ভিতর একদিন ভুলে মাস্ক পরেটে না নিয়ে বাইরে চলে আসলাম। পড়লামও সোজা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে! ব্যাস, সীমিত আকারে একটা মামলা খেয়ে গেলাম! এরপর থেকে বাইরে এলে মাস্ক আর আমার মুখ থেকে নামেনি। এই ৬/৭ মাস আমি রেণ্ডলার মাস্ক পরে বের হয়েছি। এবং অবাক করা ব্যাপার হলো, আমি চাইলেও এখন আর মাস্ক ছাড়া বাইরে আসতে পারি না। কোনোদিন ভুলে মাস্ক ছাড়া বের হয়ে গেলে খুব আনইজি লাগে। ছয় মাস আগে মাস্ক পরলে আনইজি লাগতো, এখন মাস্ক না পরলে আনইজি লাগে। অবাক ব্যাপার! বুঝলাম এটা একটা নতুন অভ্যাস। কিন্তু এ অভ্যাসটা তৈরি হলো কিভাবে? তার মানে চাইলেই কি যেকোনো ভালো অভ্যাস তৈরি করা সম্ভব?

আচ্ছা এই অভ্যাস জিনিসটা আসলে কী? অভ্যাস তৈরি হয় কিভাবে? কিছু মানুষ কিভাবে অভ্যাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুনিয়া-আধিরাতে মহাসফল হয়ে যাচ্ছে? আবার কিছু লোক কিভাবে কিছু খারাপ-দুষ্ট-অভ্যাসের পাল্লায় পড়ে দুনিয়া-আধিরাত দুটোই হারাচ্ছে?

তুমি যখন প্যান্ট পরো, প্রথম পা কোন পাশে দাও? কিংবা জুতা পরার সময়? ব্রাশ করার সময় কোন পাশ থেকে ব্রাশিং শুরু করো? যদি কয়েকদিন খেয়াল করো, দেখবে এ সবগুলো কাজ তুমি প্রতিবার নির্দিষ্ট একটা দিক থেকে শুরু করছো। কিন্তু তুমি কখনোই এমনটা ভেবে-চিন্তে করোনি যে আজকে আমি প্রথমে বাম পায়ের জুতাটা পরবো। তুমি কিছু চিন্তা করার আগেই তোমার ব্রেইন তোমাকে কাজটা অটোমেটিক্যালি কোনোপ্রকার চিন্তা ভাবনা করা ছাড়াই করিয়ে নিচ্ছে!

ব্রেইনের এই যে চিন্তাভাবনা না করেই কোনো একটা কাজ অটোমেটিক করিয়ে ফেলার যে ব্যাপার, এটাই হচ্ছে Habit বা অভ্যাস। আমাদের দৈনন্দিন জীবন এরকম কিছু অভ্যাস নিয়ে গঠিত। এবং একজন মানুষের জীবন কেমন হবে, মানুষ তাকে কতটুকু সম্মান করবে, তার ব্যক্তিত্ব কেমন হবে বা এককথায় তার জীবনে সে কতটুকু সফল কিংবা ব্যর্থ হবে, তা নির্ভর করে তার দৈনন্দিন অভ্যাসগুলো কেমন তার উপর। এইটা আমার নিজের কথা না। John Dryden নামক এক ইংলিশ কবির কথা- "We first make our habits, then our habits make us." এখন প্রশ্ন আসতে পারে অভ্যাস তৈরি হয় কিভাবে?

অভ্যাস তৈরি হতে প্রধানত চারটি জিনিস লাগে। Cue(উদ্দীপক), Craving(আকাঙ্ক্ষা), Action(কাজ) এবং Reward(পুরস্কার)। নিচে এগুলো সম্পর্কে আমরা বিজ্ঞানিত জানব। শুধু তা নয়, বরং এই চারটি উপাদান ব্যবহার করে কিভাবে নতুন নতুন ভালো অভ্যাস গড়া যায় এবং পুরাতন খারাপ অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করা যায় তাও জানবো।

উদ্দীপক(Cue)

যেকোনো অভ্যাস তৈরির শুরুটা হয় উদ্দীপক দিয়ে। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে। ধরো, তোমার স্কুলে/কলেজে যাওয়ার পথে একটা মিষ্টির দোকান আছে। একদিন যাওয়ার সময় দোকানে নতুন এক প্রকারের মিষ্টির দিকে তোমার চোখ পড়ল। এবং নতুন এই মিষ্টিটা একটু চেখে দেখার জন্য তোমার মন আকুপাকু করা শুরু করলো। এইব্যে মিষ্টি দেখে তোমার মনে মিষ্টি যাওয়ার যে ইচ্ছা তৈরি হলো, স্বাদ নেওয়ার যে লোভ সৃষ্টি হলো, একেই বলে উদ্দীপক। ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন: কোনো শব্দ, ছবি, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি ইত্যাদি। উদ্দীপক মিষ্টির দিকে চোখ পড়ামাত্র তোমার মন্তিষ্ঠ তোমাকে বলতে লাগল, "মনে হচ্ছে এই মিষ্টির স্বাদটা খুব অস্থির হবেরে! চল এটা

কিনি!" এখান থেকে তৈরি হয় দ্বিতীয় উপাদান; Craving বা আকাঙ্ক্ষা।

আকাঙ্ক্ষা(Craving)

আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে কোনো একটা কাজ করার জন্য motivational force বা প্রেরণা-শক্তি। মানে কোনো কাজ নিজ থেকে করতে হলে প্রথমে আমাদের মনে ঐ কাজের জন্য একটা বিশেষ আগ্রহ থাকতে হয়। এইব্যে মনে করো দোকানের ঐ মিষ্টিগুলো তোমার কিনতে মন চাচ্ছে, এটা চাচ্ছে কারণ তোমার মনে মিষ্টিগুলোর স্বাদ চেখে দেখার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। যদি এমন হতো তুমি মিষ্টি খাবার তেমন একটা পছন্দ করো না। তাহলে মিষ্টি দেখে তোমার মনে কোনো আকাঙ্ক্ষাও হতো না। ফলে মিষ্টিও কেনা হতো না। আমাদের মনে আকাঙ্ক্ষা তখনই তৈরি হয়, যখন ঐ কাজ করে আমাদের ব্রেইন কোন মজা পায়। কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো করলে আমাদের ব্রেইনে মজা লাগার জন্য যে কেমিক্যাল দরকার, সেগুলো অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষরণ হয়। ডোপামিন, অক্সিটোসিন, সেরাটোনিন আর এন্ডোরফিন হচ্ছে মজা লাগার কেমিক্যাল।

কাজ(Action)

মূলত অভ্যাস বলতে আমরা এ অংশকে বুঝি। দোকানের ডিসপ্লেতে 'উদ্দীপক' মিষ্টি দেখে তোমার টেস্ট করার 'আকাঙ্ক্ষা' তৈরি হয়েছিল। এজন্য তুমি মিষ্টি কিনে আনলে। বাড়ি ফিরে বহু প্রতিক্ষার পর এবার তোমার সেই মিষ্টিগুলো খাওয়ার পালা। দ্রুত প্যাকেট খুলে মিষ্টিগুলোর দিকে একবার তাকালে। দেখতেই মন খুশি হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে প্যাকেট থেকে একটা মিষ্টি তুলে বাড়িয়ে দিলে মুখের ভিতর। ব্যাস, শেষ হয় গেল Action বা কাজ পর্ব। এবার শুধু মজা নেওয়ার পালা।

পুরস্কার(Reward)

রসে টস্টসা প্রথম মিষ্টিটা মুখে দিতেই আবেশে তোমার চোখ-মুখ বুজে এলো। ব্রেইনজুড়ে নেমে এলো কেমিক্যালের বন্যা। অসম্ভব মুঞ্চতায় মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, "আহ..!"। মিষ্টি কেনার এত কষ্ট, এত খরচ সব যেন এ স্বাদের কাছে তুচ্ছ মনে হলো। প্রতিটি অভ্যাসের মেইন গোল থাকে এই পুরস্কার পাওয়া। বা বলা যায় শুধু পুরস্কার পাওয়ার লোভেই এই প্রসেসগুলো ঘটে থাকে।

তোমার ব্রেইন এই পুরো প্রসেসটা কিন্তু মনে রাখে। যদি এমন হয় কোনো একটা কাজ করতে পুরস্কারের চেয়ে কষ্ট বেশি হয়, ব্রেইন সে কাজকে কষ্টের লিস্টে তুলে রাখে। এবং এইসব কাজের ব্যাপারে তোমাকে ডিমোটিভেট করতে থাকবে। এজন্যই ব্যায়াম, পড়াশোনা, রেণ্ডলার ইবাদাত এসব কাজকে অভ্যাসে পরিণত করতে কষ্ট হয়। কারণ এসব কাজে পুরস্কার পেতে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু কোন কাজে যদি

অল্প কষ্টে, অল্প সময়ে বেশি পুরস্কার পাওয়া যায়, তখন সে এই কাজকে খুব পছন্দ করে। তোমাকে বারবার বারবার এই কাজের কথা মনে করিয়ে দিতে থাকবে। এজন্য গেমস, অনলাইনে বাজে ব্রাউজিং, মিডিজিক, ফাস্টফুড এসবে আসক্ত হওয়া সহজ।

চলো এইবার জেনে নেওয়া যাক নতুন ভালো অভ্যাস যেভাবে তৈরি করব-

- অবশ্যই চোখের সামনে একটা উদ্দীপক রাখবে, যা দেখে তোমার নতুন কাজের কথা মনে পড়বে।
- আকাঙ্ক্ষাকে আকর্ষণীয় করো, যাতে কাজের প্রতি তোমার আগ্রহ আসে।
- কাজটাকে যতটা পারো সহজ করে করো, যাতে মন্তিষ্ঠমশাই বিরক্ত না হয়।
- পুরস্কারকে তোমার জন্য উপভোগ্য করো, যাতে কাজটা করে ব্রেইন মজা পায়।

এইবার দেখে নেওয়া যাক বাস্তবিক কিছু উদাহরণ। ধরো, লকডাউনে শুয়ে বসে থাকতে থাকতে তোমার ওজন ৬/৭ কেজি বেড়ে গেছে। এখন ডিসিশন নিলে কাল থেকে রেগুলার দৌড়াব। এখন ডিসিশন তো নিলে। কিন্তু কালকে তুমি তা ভুলে যাবে। এজন্য তুমি একটা কাগজে 'দৌড় প্রতিদিন' কথাটা লিখে দরজায় লাগিয়ে দিলে। পরদিন সকালে যখন দুম থেকে উঠবে, তখন এই লেখাটা তোমার চোখে পড়বে। এই হলো তোমার নতুন অভ্যাসের Cue বা উদ্দীপক।

উদ্দীপক না হয় সেট করলে। কিন্তু দৌড়ানো তো খুব কষ্টের একটা কাজ, মন তো চাইবে না। যদি কোনো রিওয়ার্ড পাওয়া যেত, তাইলে হয়তো মনকে সাঞ্চনা দিয়ে হলুও দৌড়ানো যেত। এজন্য তুমি ঠিক করলে যদি তুমি রেগুলার দৌড়াতে পারো, তবে প্রতি কেজি ওজন কমানোর জন্য একটা করে পছন্দের বই কিনে পড়ব। এই হয়ে গেলো তোমার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা। এখন এই বইয়ের লোভ তোমাকে দৌড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় motivation-force দিবে।

উদ্দীপক, আকাঙ্ক্ষার পর এবার কাজের পালা।

প্রথম দিনেই দৌড়ায়ে ২/৪ কেজি কমিয়ে ফেলব এমন টার্গেট ভুলেও নেওয়া যাবেনা। তোমার ব্রেইন যখন দেখবে হৃটহাট করে তুমি ওরে প্রচুর কষ্ট দেওয়া শুরু করেছো, তখন ও বলবে "আরে রাখতো! তোর শরীর এত কষ্ট নিতে পারবে না। তুই দুর্বল হয়ে পড়বি! পরে করিস এসব! এখন চিল কর!" ব্যাস! তোমার ওজন কমানোর মিশনের এখানেই সমাপ্তি। এজন্য প্রথম দিকে এমন টার্গেট নিবে যেটা তোমার জন্য কোনো কিছুই মনে হবেনা। তোমার ব্রেইনও

তেমন ঝামেলা করবেনা। হতে পারে প্রথম দিন তুমি টার্গেট নিলেন আমি আজকে মাত্র তিন মিনিট দৌড়াব, দ্বিতীয় দিন চার মিনিট, তৃতীয় দিন ছয় মিনিট। সময়ের সাথে আস্তে আস্তে বাঢ়াবে। এতে করে তোমার ব্রেইনকে বোকা বানানো সহজ হবে। ব্রেইন ভাববে কাল চার মিনিট দৌড়েছি। আজকে ছয় মিনিট। মাত্র দুমিনিট বেশি। এ তেমন বড় কিছু না। ব্যাস, কাজের পালা শেষ। এবার শুধু দৌড়াবে, আর এক সঙ্গে পর পর রিওয়ার্ড নিবে। তোমার ব্রেইন এই প্রসেসে একবার মজা পেয়ে গেলে, নেক্সট টাইম ও নিজ থেকে তোমাকে দৌড়ানোর জন্য অনুপ্রেণা দিবে। এবং ধীরে ধীরে রেগুলার দৌড়ানো তোমার এক সহজাত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। বলেছিলাম না নতুন অভ্যাস বানানো কোনো কঠিন কাজ না! জাস্ট চিল!

পুরাতন বদ-অভ্যাসগুলো পাল্টাব কী করে?

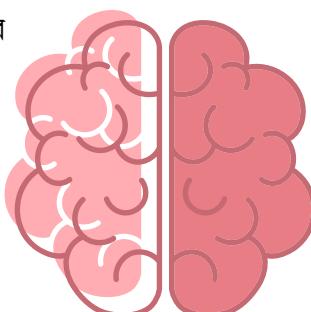
চারটি জিনিস ব্যবহার করে অভ্যাস যেমন বানানো যায়, তেমনি পুরাতন বদঅভ্যাস পাল্টানোও যায়, সেম প্রসেসঃ

- "উদ্দীপক"কে তোমার ত্রিসীমানার বাইরে রাখো, যাতে করে খারাপ অভ্যাসের কথা তোমার মনে না আসে।
- খারাপ কাজের জন্য তোমার যে "আকাঙ্ক্ষা", সেটাকে অনাকর্ষণীয় করে তোলো।
- ওই খারাপ কাজটা করার পরিবেশ কঠিন করে ফেলো।
- খারাপ কাজ থেকে যে মজা পেতে, সে মজাকে তিক্ততার স্বাদে ভরপুর বানিয়ে দাও।

যেমন: তোমার ফেসবুকে প্রচুর আসক্তি আছে। দিনে ৫/৬ ঘন্টা ফেসবুকে কিভাবে কেটে যায় তুমি ভেবেই পাও না। ফলে ক্লাসের পড়া, বাসার কাজ, নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোনো কিছুর জন্যই এনাফ টাইম পাচ্ছো না। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলে যখনই কোনো বন্ধু তোমাকে ফটোতে ট্যাগ করে

কিংবা তোমার পোস্টে কোনো কমেন্ট করে, ফেসবুক 'টুং' করে তোমার ফোনে একটা নোটিফিকেশন পাঠিয়ে দেয়। সেই নোটিফিকেশন দেখামাত্র তুমি কিসের ক্লাস, কিজের কাজ, সব একপাশে রেখে ফেসবুকে খই ভাজতে কখন যে বসে যাও তোমার নিজেরই খেয়াল থাকে না।

এই নোটিফিকেশন হচ্ছে তোমার ফেসবুক আসক্তির মহামান্য 'উদ্দীপক(Cue)-মহাশয়'! এই মহাশয় সর্বপ্রথম তোমার মনকে পড়া থেকে ফেসবুকের দিকে ঘুরায়। একে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। যাইহোক, এখন উদ্দীপক থেকে বাঁচার উপায়? ফোনে ফেইসবুকের অ্যাপ থেকে আসা সব নোটিফিকেশন অফ করে রাখা। App Settings এ গেলেই Notification বন্ধ করার অপশন পাবে। সহজ না?



এবার আকাঙ্ক্ষাকে কবর দেওয়ার পালা। ফেসবুকে চুক্তেই তুমি কি এক্সপেন্ট করো? অনেক নোটিফিকেশন। তোমার পোস্টে অনেক রিয়েষ্ট-কমেন্ট। অনেক প্রিয় মানুষের মেসেজ। আর হোমপেজে বন্ধু-বান্ধবের প্যারা-নাই-চিল টাইপ ছবি/পোস্ট। যদি তুমি ফেবুতে ঢোকার আগে কোনোভাবে জানতে পারো তোমার কোনো পোস্টে নতুন কোন লাইক-রিয়েষ্ট নাই, তেমন কেউ মেসেজ দেয় নাই, হোমপেজেও তেমন মজার কিছু নাই; তাইলে কি তুমি সেদিন ফেসবুকে চুকবে? মনে হয় না। মানে ফেসবুকে ঢোকার আগ্রহ কমে গেলো। এজন্য তুমি যেটা করতে পারো, ফেসবুকে পোস্টের পরিমাণ কমিয়ে দিলে। নোটিফিকেশন কম আসবে। খুব দরকার না হলে লোকজনদের অথবা ফেসবুকে মেসেজ দেওয়া অফ রাখো। ডি঱েন্ট ফোনকল দাও, মেসেজ কমে গেল। হোমপেজে যেসব বন্ধুর পোস্ট বেশি আসে, ওদের কয়েকদিনের জন্য আনফলো করে রাখো। হোমপেজে মজার জিনিস আসা কমে গেল। কয়েকদিন এভাবে চলার পর দেখবে ফেসবুকে আসা কেমন যেন বোরিং হয়ে গেছে। আকাঙ্ক্ষার কবরে গাছ লাগানো শেষ।

এবার কাজকে ধোলাই করার পালা। কাজ বলতে ফেসবুক চালানো কঠিন করে দেওয়া। এক্ষেত্রে কি করা যায়? প্রথমেই ফেসবুকের অ্যাপ আনইস্টল করে দিতে হবে। আনইস্টল করতে না পারলে অ্যাপটি লক করে রাখতে পারো। যার পাসওয়ার্ড কিংবা সিকিউরিটি প্যাটার্ন দিয়ে দিবে তোমার বাবা কিংবা মা। ফলে প্রতিবার ফেসবুকে চুকতেই তাদের শরণাপন্ন হতে হবে যা এক বিরাট ঝামেলার ব্যাপার! এছাড়া অ্যাপ থেকে ফেসবুকে ঢোকা সেকেন্ডের ব্যাপার। অ্যাপের পরিবর্তে ব্রাউজার ইউজ করবে। ব্রাউজারে এক পেজ থেকে আরেক পেজে যেতে লোডিং টাইম লাগে। ফলে বারবার লোড হতে হতে বোরিং লেগে উঠে। এছাড়া পাসওয়ার্ড সেট করবে বিশাল সাইজের। আর প্রতিবার ফেসবুক থেকে বেরোনোর সময় লগআউট করে বের হবে। এতে পরেরবার ফেসবুকে চুকতে হলে এই বিশাল পাসওয়ার্ড, মেইল দিতে হবে। তারপর ঢোকা যাবে। যেটা

মোটামুটি কষ্টকর একটা প্রসেস। এরকম বহু টেকনিক ব্যবহার করে ফেসবুকে ঢোকাকে কঠিন করা যায়।

সর্বশেষ, পুরক্ষারের মজাকে তেঁতো বানিয়ে নেওয়া। এতসব প্রসেস ব্যবহার করে ফেসবুকে ঢোকাকে যখন তুমি খুব কঠিন করে দিবে, তখন ফেসবুকে চুকতে মজা লাগার বিপরীতে কষ্ট লাগতে শুরু করবে। তোমার ব্রেইন ফেসবুক ব্রাউজিংকে মজার কাজ না ভেবে আস্তে আস্তে বোরিং কাজ হিসেবে ধরে নিবে। ব্যাস, ফেসবুকের রিওয়ার্ডও শেষ। যেহেতু ফেসবুক থেকে কোনো রিওয়ার্ড আসছে না, ব্রেইন তখন মজা পাওয়ার জন্য ডে-বাই-ডে ফেসবুক হ্যাবিটকে ভুলতে শুরু করবে।

ব্যক্তিভেদে অভ্যাস গড়া কিংবা ভাঙ্গার এ বিষয় কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। তবে মোটামুটি Cue, Craving, Action, Reward এই চারটি জিনিস ভালোভাবে বুঝতে পারলে যে কেউ চাইলে নতুন যেকোনো অভ্যাস গড়তে বা পুরাতন অভ্যাস ভাঙ্গতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু অভ্যাসের মতো এত পাওয়ারফুল একটা টুল গড়ার জন্য শুধু এটুকু যথেষ্ট নয়। তুমি যখন কোনো অভ্যাস গড়া বা ভাঙ্গার ব্যাসিক ফর্মুলাটা জানবে, তখন তোমার জন্য ধাপে ধাপে আগানো কিছুটা সহজ হবে হয়ত। কিন্তু তারসাথে নিজের ভেতর একটা তাড়না থাকতে হবে, "আমার এ অভ্যাস বদলাতে হবে"। যতক্ষণ না তুমি নিজের ভেতর থেকে নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করবে, তখন আল্লাহ ছাড়া পুরো দুনিয়া মিলেও তোমাকে বদলাতে পারবে না। অভ্যাসের এইসব প্যাঁচাল আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য Charles Duhigg এর Power of Habit এবং James Clear এর Atomic Habits বইদুটো পড়তে পারো।

আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তাআ'লা যেন আমাদের সবাইকে সমস্ত পাপ, সমস্ত খারাপ আসক্তি থেকে বের হয়ে আসার শক্তি দান করেন। তোমাদের জন্য রইলো অনেক দু'আ সেইসাথে অনেক অনেক ভালোবাসা।





ফিরবে কবে বলো

নিশাত তাসনিম

সকালে ঘুম ভাঙ্গে প্রায় ১২টা পেরিয়ে। মায়ের আদরমাথা কঠে নাস্তার টেবিলে গিয়ে নাস্তাটা সেরে ফেলতেই চ্যাটিং-এ হ্যাংআউট ফিল্ড হয়ে যায়। সারাটা দিন কাটে প্রিয় বন্ধুদের সাথে, হৈ-হল্লোড়, গান-বাজনা, আড়ডা, মৌজ-মাস্তি, আরো কত কি! পাশাপাশি কিছু সেলেরিটি বন্ধু তো আছেই, যারা বাইকে আসবে, সুন্দর সুন্দর ছবি তুলে দিবে, রেস্টুরেন্টে বিল পে করে দিবে। আবার, বাড়িতে ফিরতেই সেই সব ছবি ফেসবুকের মত বড়সড় একটা ওয়ালে ঝুলিয়ে দেয়ার মধ্যে এতই মন্ত হয়ে যাওয়া হয় যে মা সারাদিন কল দিচ্ছিলো; কোথায় কিভাবে সময় কাটিছে তা জানার জন্য, সেই চিন্তাও মাথায় আসছে না যে, মায়ের কাছে গিয়ে একটু বসি। ছবি দেয়ার সাথে সাথেই সকল ফ্রেন্ড-ফলোয়ারের রিয়েষ্ট আর কমেন্টের জোয়ার ভেসে আসে। সেগুলো গুণতে শুরু করা। সবার ওয়াও, আম্যাজিং, বিউটিফুল টাইপ কমেন্টে দেখে আনন্দ পাওয়া।

সবার নজরে এভাবে ক্লাসি হয়ে উঠা কতই না কঠের ছিল। কত সময় ব্যয় হয় সাজতে, ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে ভিন্নভিন্ন পোজ নিয়ে ছবি তুলে বারবার চেক করতে হতো সুন্দর দেখাচ্ছে কি-না, তারপর আবার সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো সিলেষ্ট করে ফেসবুক কিংবা ইঙ্গোতে দেওয়া, কখনো কখনো ঘণ্টার পর

ঘণ্টা লাগিয়ে এডিটও করা। মায়ের সাথে রাগারাগি করে, আবার কখনো কখনো ব্ল্যাকমেইল করে হাই-ক্লাস সব নামি-দামি জামা কিনতে চাওয়া, প্রতি মাসে ২-৩টা নতুন জামার জন্য বায়না ধরা। কখনো কখনো উত্তেজনায় মাকেই কটু কথা বলা হয় তাও খেয়াল করা হয় না। মা কাঁদলেও অতসব ভাববার দরকারই বা কি! নিজে নিজে তো সব একসময় ঠিক হয়েই যাচ্ছে। আবার মেক-আপ কিট দিয়েও ভরপুর না রাখলে দেখতে একদমই অসহ্য লাগে ড্রেসিং টেবিলটাকে। এগুলো না ব্যবহার করলে নিজেকে কেমন বিদঘৃটে লাগে না অন্যদের সামনে? নিজেকে ক্লাসি আপডেইটেড হিসেবে প্রদর্শন করার জন্য এগুলা খুব একটা আনইউজ্যুয়ালও নয়। তার সাথে একজন বয়ফ্রেন্ডও দরকার হয় কিন্তু নিজেকে একটা অর্ডিনারী হিসেবে একটা খ্যাতি অর্জনের জন্য। যখনই তার সাথে কোনো ছবি আপলোড করা হয়, তখনই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, তাই না? ‘নাইস কাপল’, ‘কিউট কাপল’, ‘দোস্ত তোর মত যদি আমারও এমন একজন থাকতো’, ‘সত্যই তোর লাইফটা সেরা, ইশ্য যদি আমি তোর লাইফটা ক্যারি করতে পারতাম’ এমন সব কমেন্টস কার না ভালো লাগে? বেশিরভাগ বান্ধবীরাই আমার লাইফের মতো একটা লাইফ চায় যেখানে, সেখানে কি আমি অন্যদের থেকে সেরা নই? অনেকগুলো বন্ধুবন্ধব আর একটা লয়্যাল বয়ফ্রেন্ড,

নিজেকে হাই-ক্লাসড দেখানোর জন্য
সকল ধরনের ইকুইপমেন্টস, লাইফে
এগুলো থাকলে আর কি প্রয়োজন
বাকি থাকে তা জানা নেই।

কিন্তু..

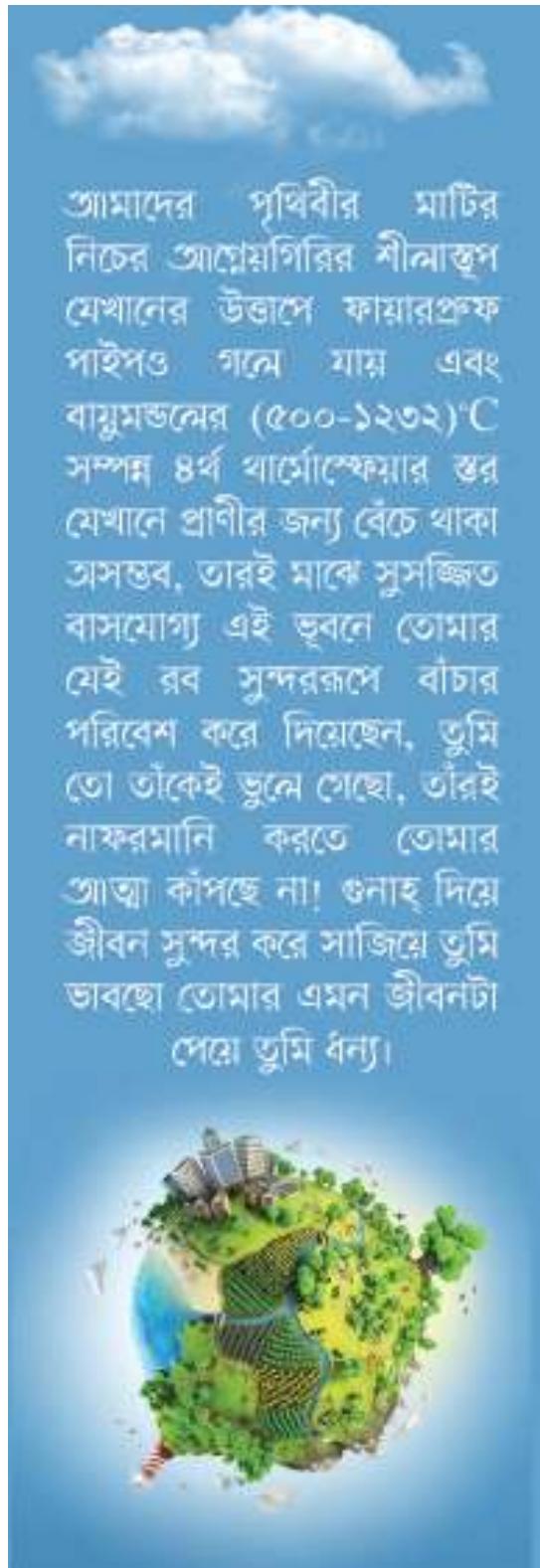
কিন্তু সত্যিই কি তাই? আর কিছু কি
আদতেও প্রয়োজন হয় না?

মনে আছে যখন আদরী বান্ধবীটা
অন্যের কাছে গীবত করেছিলো?
মন ভেঙেছিলো তখন? আর বিশ্বাস?
যখন তার কথাগুলোতে বিশ্বাসটা ও
ভাঙা কাঁচের টুকরোর মত চূণবিচূণ
হয়ে গিয়েছিল তখনো কি 'লাইফটা
সেরা' ফিলিংস্টা কাজ করেছিলো?
পাহাড় পরিমাণ ভালোবাসা ছিল
যেই মানুষটার প্রতি, যে আপনাকে
ননীর পুতুলের মত তার জীবনে
সাজিয়ে নিয়েছিল, যেই মানুষটা
তাকে ছাড়া একদম অচল বানিয়ে
দিয়েছিল তোমাকে, যাকে ছাড়া
একবেলা চলতো না, সেই মানুষটা
যখন বাস্তবের প্রতিবন্ধকতা দেখিয়ে
তোমার হাতটা খুব অযত্নে ছেড়ে
দিয়েছিলো তখন কেমন লেগেছিলো
দুনিয়াটা? খুব অসহায় মনে
হয়েছিলো অবশ্যই! মানুষ না পারেও
বটে, সত্যিই খুব নাফরমানি করতে
জানে তারা।

কিন্তু তুমি? তুমিও তো ঠিক
তেমনটিই। তোমার এবং তাদের
মধ্যেও কিন্তু খুব একটা তফাত নেই!

একটু ভেবে দেখেছো রবের দেয়া
অনুগ্রহের কথা! আমাদের পৃথিবীর
মাটির নিচের আগ্নেয়গিরির শীলাস্তুপ

যেখানের উভাপে ফায়ারপ্রফ পাইপও গলে যায় এবং
বায়ুমণ্ডলের $(500-1232)^{\circ}\text{C}$ সম্পন্ন ৪৮ থার্মোক্ষেয়ার
স্তর যেখানে প্রাণীর জন্য বেঁচে থাকা অসম্ভব, তারই মাঝে
সুসজ্জিত বাসযোগ্য এই ভূবনে তোমার যেই রব সুন্দররূপে
বাঁচার পরিবেশ করে দিয়েছেন, তুমি তো তাঁকেই ভুলে গেছো, তাঁরই
নাফরমানি করতে তোমার
আত্মা কাঁপছে না! ওনাহ দিয়ে
জীবন সুন্দর করে সাজিয়ে তুমি
ভাবছো তোমার এমন জীবনটা
পেত্তে তুমি ধীন্য।



না! ওনাহ দিয়ে জীবন সুন্দর
করে সাজিয়ে তুমি ভাবছো
তোমার এমন জীবনটা পেয়ে
তুমি ধীন্য। আবার যখন মানুষ
তোমাকে কষ্ট দিয়ে চলে যায়
তখন আবার দোষ দিয়ে বসো
তোমার রবের ওপর এই ভেবে
যে তিনি কেনো তোমার জীবনটা
এমন করে দিয়েছেন। ভাবতে
ভাবতে তোমার হৃদয় শুকিয়ে
আসে। তুমি তাঁরই নাফরমানি
করতে থাকবে আবার তুমি
এটা ও আশা রাখছো যে তোমার
জীবনটা ফুলেল হয়ে ভাসবে,
দুঃখ-কষ্টের দাগ পড়বেনা, একা
হয়ে পড়বে না! ইচ্ছাকৃতভাবে
হারামে খচিত জীবনে তুমি
তোমার রবের রহমত আশা
করছো এটা হাস্যকর নয় কি?
অথচ তবুও তোমার রাবে
কারীম তোমাকে তৎক্ষণাত
শাস্তি দিচ্ছেন না, তোমার শ্বাস
ছিনিয়ে নিচ্ছেন না তিনি, আর
সেটা তুমি অনুভবও করছো না।
দুনিয়ার এই ভ্রান্ত মোহে ভুবে
তুমি প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে
হারাচ্ছো, নিজের কর্মফল বিনষ্ট
করছো, তোমার সময়-সুযোগ
সব নষ্ট করেই যাচ্ছো। এতে
তোমার হৃদয়ে সামান্যতম ধাক্কা
লাগছে না! আর কতটা সময়
পেরোলে বুবাবে তোমার আসল
পরিচয়? কতটা সময় গেলে
তুমি তোমার জীবনের আসল
ব্যাখ্যাটা জানতে পারবে?
কতটা সময় নষ্ট করে তুমি
তোমার রবের সাগরসম রহমত
উপভোগ করার জন্য তাঁরই সন্তুষ্টির ছায়াতলে ফিরে আসবে?

কি ভাবছো, সেই সময় এখনও আসেনি? জীবনের কিছুটা
ভাগ এভাবে পার করে পরে ফিরে এসে তাওবাহ করার
কথা ভাবছো নিশ্চয়ই? কিন্তু সেই সুযোগ কতটুকু সময়
পর্যন্ত আছে সেটা কিভাবে জানো তুমি? তোমার হারাম

লাইফস্টাইলের উপর যদি একবার আমাদের রবের ক্ষেত্রে লা'ন্ত পড়ে যায়, তাহলে হয়ত আর সেই ফিরে আসার সুযোগটা কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়। তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই যে অগণিত শ্বাস নিচ্ছা, তোমার এই প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তোমার এক-একটি সুযোগ যা তুমি অনবরত নষ্ট করেই যাচ্ছো। অথচ, স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে গুনাহের জন্য ইস্তিগফার করো, অতপর (তাওবা করে) তারই দিকে ফিরে আসো; তাহলে তিনি আসমান থেকে তোমাদের ওপর বারিধারা বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দিবেন। সুতরাং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।’[১]

আর যদি ভেবে থাকো যে তুমি এতই গুনাহ করে ফেলেছো যা নিয়ে রবের কাছে ক্ষমা চাওয়া যাবে না তাহলে তুমি এখনো আল্লাহ এর রহমতের ব্যাপারে জানোই না।

রাসুল ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ তা'আলা একশটি রহমত নির্ধারন করেছেন। অতপর নিজের কাছে নিরানবইটি রেখে জমিনে একটি অবতীর্ণ করেছেন। এ কারণেই সৃষ্টিজীব পরস্পরে একে অপরের প্রতি দয়া করে। এমনকি পশু তার শাবক থেকে খুড় উঠিয়ে নেয় তার গায়ে আঘাত করার ভয়ে।’[৩]

এখন একবার ভেবে দেখ, সময়ের শুরু থেকে শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া পর্যন্ত প্রতিটি সৃষ্টি দয়া দেখাচ্ছে- যেকোনো পাখি, যেকোনো প্রাণী, যেকোনো মানুষ দেখিয়ে যাচ্ছে যেকোনো সৃষ্টির প্রতি, যেকোনো গাছের প্রতি। তুমি এই সব দয়াগুলোকে যদি একত্রিত করো, হাজার হাজার বছর ধরে এই সমস্ত দয়া মাত্র এক শতাংশ দয়া থেকে এসেছে। আর ৯৯ ভাগ দয়া আল্লাহ শুধু একদিন ব্যবহার করবেন। আর সেই দিনটি হল ইয়াওমুন্দীনের দিন, অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন। এই জন্যই আমাদের রাসুল ﷺ বলেছেন, ‘যদি কাফির জানতো আল্লাহ আজ্ঞা ওয়া জাল্লা কর দয়ালু তাহলে কাফিরও জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে আশাবাদী থাকতো।’[৪]

এটাই হলো আল্লাহর দয়ার শক্তি, কিন্তু তাও আমরা ফিরব না। আমরা আমাদের নফসের দাসত্ব করতেই থাকব। আর এজন্যই আমরা সময়ে-অসময়ে নানান বিপদ-আপদের সম্মুখীন হই। একটি আয়াতে আল্লাহ ﷺ বলেন, ‘তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর তিনি তোমাদের (অপরাধ) কর্ম ক্ষমা করে দেন।’[৫]

এবং অপর আয়াতে উল্লেখ করেনঃ

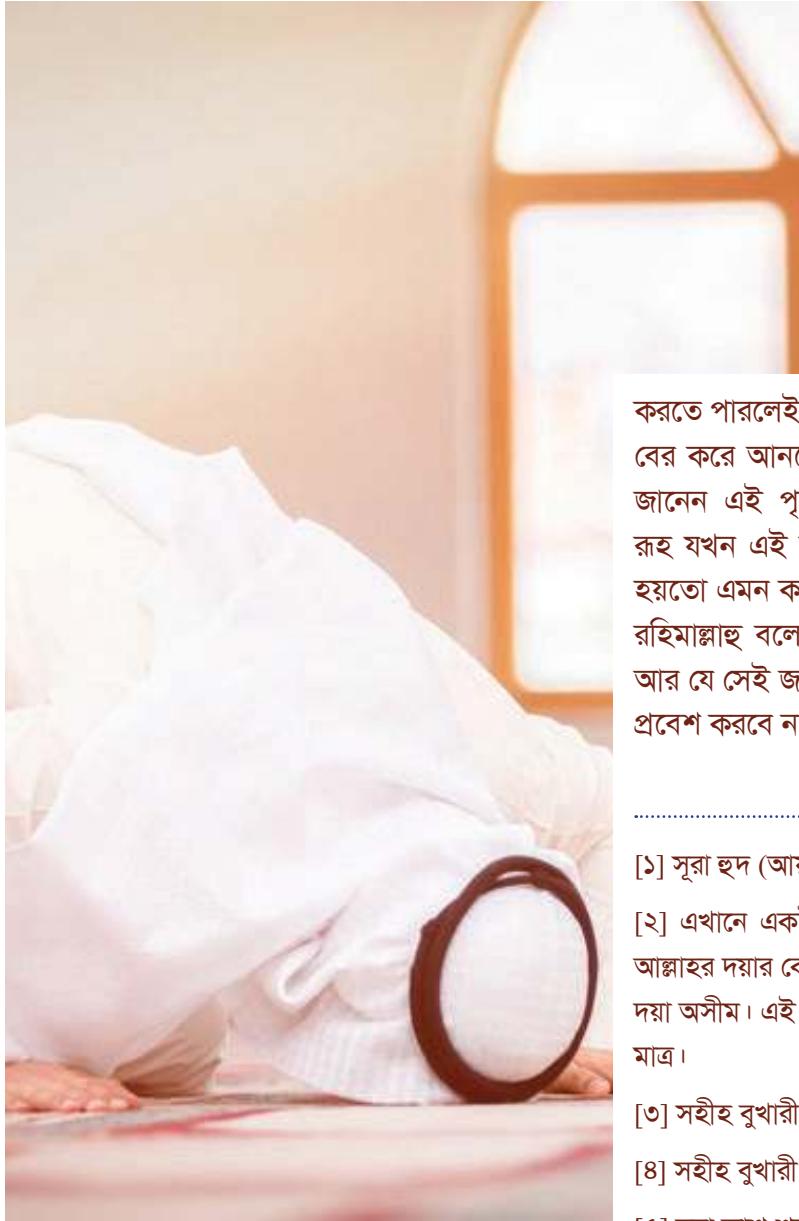
‘আমি তাদেরকে (আখিরাতের) গুরু শাস্তির আগে (দুনিয়াতেও) লঘু শাস্তির স্বাদও আস্থাদন করাবো, যাতে তারা ফিরে আসে।’ [৬]

অথচ হায়! মানুষ যদি বুবাতো হয়ে রবাইল বিন মাইসারাহ উকাইলি রহিমাল্লাহু বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার রবকে চিনেছে, সে তাঁকে ভালোবেসেছে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চিনতে পেরেছে, সে দুনিয়াবিমুখ হয়েছে। মুমিন বান্দা অপ্রয়োজনীয় কাজে লিঙ্গ হয় না যতক্ষণ না সে (আল্লাহ থেকে) গাফেল হয়ে পড়ে; আর যখন সে তার কৃতকর্মের কথা ভাবে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।’[৭]

আমরা শুবুই আল্লাহ ﷺ এর উপাসনা করিনা, আমরা আল্লাহ ﷺ এর দাসত্ব করি। এমনটি নয় যে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লাম, রোজা রাখলাম, যাকাত দিলাম— ব্যাস! আল্লাহ ﷺ এর সাথে আমাদের সম্পর্ক শেষ; এরপর আমি যা খুশি তা-ই করতে পারি। বরং আমরা সবসময় আল্লাহ ﷺ এর দাস। যুমের থেকে উঠার পর থেকে যুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটা কাজে, প্রতিটা কথায় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে: আমরা আল্লাহর ﷺ দাস এবং আমরা যে কাজটা করছি, যে কথাগুলো বলছি, তাতে আমাদের প্রভু সম্মতি দিবেন কিনা এবং প্রভুর কাছে আমি জবাব দিতে পারব কি না।

এমন মানুষ আছে যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে পড়ে, কিন্তু ব্যাংকের একাউন্ট থেকে সুদ খায়, সুদে লোন নিয়ে বাড়ি কিনে, কাউকে ভিক্ষা দেবার সময় বা মসজিদে দান করার সময় মানিব্যাগে সবচেয়ে ছোট যে নেটটো আছে সেটা খোঁজে। আবার এমন মানুষ আছে যারা হজ্জ করেছে, লম্বা দাঁড়ি রেখেছে কিন্তু বাসায় তার পরিবারের সাথে চরম দুর্যোগের করে। আরেক ধরনের মানুষ আছে যারা ঠিকই নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, যাকাত দেয়, কিন্তু ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেয় বিধীমীদের বিয়ের রীতি অনুসরণ করে গায়ে-হলুদ, বউ-ভাত করে। এদের সবার সমস্যা একটি, এরা এখনও জীবনের সবক্ষেত্রে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। এদের কাছে ‘লোকে কী বলবে বেশি’ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ‘আমার রব কী বলবেন’ তা কম গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা যখন নিজেদেরকে আল্লাহ ﷺ এর দাস হিসেবে ঘোষণা দিব, তখনই আমরা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন করতে পারব। যতদিন সেটা করতে না পারছি, ততদিন আমরা ‘লোকে কী বলবে’ এর দাস হয়ে থাকব, দুনিয়ার দাস হয়ে থাকব। বিনোদন, সংস্কৃতি, সামাজিকতার দাস হয়ে থাকব। একমাত্র আল্লাহর প্রতি একান্তভাবে দাসত্ব



করতে পারলেই আমরা এই সব মিথ্যা দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে বের করে আনতে পারবো। যারা সেটা করতে পেরেছেন, তারা জানেন এই পৃথিবীতে সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ কত মধুর! রূহ যখন এই স্বাদ আস্থাদন করতে পারে, তখন জীবন থেকে হয়তো এমন কথাই বের হয়ে আসে, যেমনটা ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাল্লাহু বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই দুনিয়াতে একটি জাগ্রাত আছে। আর যে সেই জাগ্রাতে প্রবেশ করল না, পরকালের জাগ্রাতেও সে প্রবেশ করবে না।’ [৮]

[১] সূরা হৃদ (আয়াতঃ ৫২)

[২] এখানে একটা ব্যপার মনে রাখুন, এটি একটি প্রতিকী হাদিস। আল্লাহর দয়ার কোনো শেষ নেই, তাঁর দয়াকে ভাগ করা যাবে না। তাঁর দয়া অসীম। এই উদাহরনের মাধ্যমে আমাদেরকে ধারণা দেয়া হয়েছে মাত্র।

[৩] সহীহ বুখারী (৬০০০), সহীহ মুসলিম (২৭৫২)

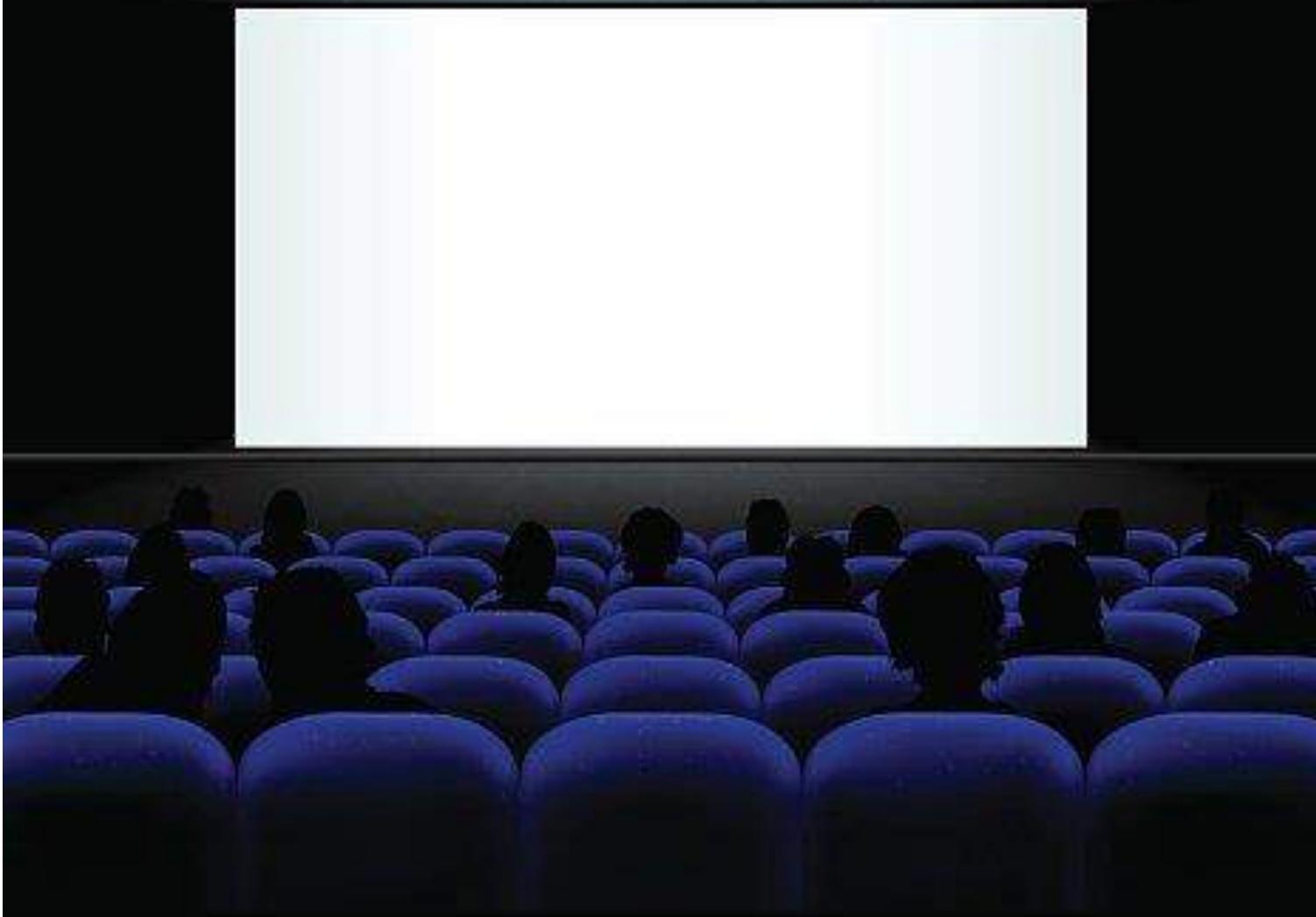
[৪] সহীহ বুখারী (৬৪৬৯), সহীহ মুসলিম (২৭৫৫)

[৫] সূরা আশ-শূরা (আয়াতঃ ৩০)

[৬] সূরা সাজদা (আয়াতঃ ২১)

[৭] আয যুহুদ ওয়ার রাকায়েক; আল্লাহই ইবনুল মুবারক (২০৯), মুসামাফে ইবনে আবী শাইবা (৩৬৮২৩)। তবে মুসামাফের বর্ণনাসারে কথাটি হয়রত মাতার আল ওয়াররাক রহ. এর ও হতে পারে।

[৮] আল ওয়াবিলুস সায়িব মিনাল কালিমিত তায়িব; ইবনুল কায়িম পঃ ৪৮, মাদারিজুস সালিকীন; ইবনুল কায়িম ১/৪৫২। দ্রষ্টব্য, দুনিয়ায় পাপাচার নাফরমানীর শ্রেণী থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদত আর নি:শর্ত আনুগত্যে যে অতুলনীয় স্বাদ মুমিন বান্দা উপলব্ধি করেন সেটা বোঝাতেই ‘দুনিয়ার জাগ্রাত’ কথাটি বলা হয়েছে।



মুভি-সিনেমার ধ্বনিজাল

-কামরঞ্জামান সাগর

বর্তমান প্রজন্মের ঈমান ধ্বনিকারী হাতিয়ারগুলো হচ্ছে সিনেমা, নাটক কিংবা ওয়েব সিরিজ। যেগুলো থাকে অশ্লীলতা, ভায়োলেন্স ও ক্রিমিনাল এন্টিভিটিতে ভরপুর। আজকের এই ফিল্মার দিনে ঈমান ঠিক রাখা খুবই কষ্টকর। দিন দিন বের হচ্ছে ঈমান বিধ্বংসী অনেক উৎস। আর তার মধ্যে একটি জনপ্রিয় উৎস হচ্ছে সিনেমা কিংবা ওয়েব সিরিজ। যেগুলোতে নগ্নতা অতি সহজলভ্য। সিনেমা কিংবা ওয়েব সিরিজ বের করার পূর্বশর্ত যেন নগ্নতা। যে মুভিতে যত বেশি নগ্নতা রয়েছে সেই সিনেমা জনপ্রিয়তা পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। প্রত্যেক

নাটক কিংবা সিনেমায় কম বেশি অশ্লীলতার আভাস পাওয়া যায়। তাছাড়া ওয়েব সিরিজগুলোতে মহিলাদের পণ্য সুলভ রূপেই উপস্থাপন করে থাকে, অথচ ইসলাম ধর্ম আমাদের শিখিয়েছে কিভাবে মেয়েদের সম্মান দিতে হয়। কিন্তু এই ভয়ংকর পশ্চিমা সংস্কৃতির থাবায় আমাদের পরিবেশটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এইসব অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড আজ আমাদের দেশের সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বাংলাদেশেও অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে আসছে ঈমান ধ্বনিকারী সিনেমা। সেই সাথে নতুন সংযোজন ওয়েব সিরিজ। যেগুলোর ফলে হাজার হাজার উঠতি বয়সী তরুণ-তরুণী তাদের আমল নষ্ট করছে, বের হতে পারছে না অশ্লীলতার বেষ্টনী থেকে। এখনকার নতুন প্রজন্ম এগুলোর প্রতি এতই আসক্ত হয়ে গেছে যে, নাটক-সিনেমাই তাদের সময় কাটানোর মূল উপাদান। মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতার ফলে খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছে এই নোংরা কন্টেন্টগুলো। ফলপ্রসূ, তারা তাদের হাতের মোবাইল ফোনকে বানিয়ে ফেলছে জাহানামের দিকে ধাবিত হওয়ার উৎস। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ত'আলা বলেন,

‘হে ঈমানদাগন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং
প্রত্যেকেই যেন ভেবে দেখো! আগামী কালের জন্য সে
কী অগ্রিম পাঠিয়েছে।’[১]

আজ আমরা সামান্য সময় কাটানোর জন্য পতিত
হচ্ছি শয়তানের ফাঁদে। যার ভয়াবহতার ফলে আস্তে
আস্তে আমরা পা দিয়ে ফেলি পর্ণোগ্রাফির জালে। আর
পর্ণোগ্রাফির ভয়াবহতা কম-বেশি সবারই জানা। তবে
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুল
করে, তবে সর্বোত্তম হলো সে ব্যক্তি, যে ভুলের পর
তাওবা করে।’[২]

হয়ত আজ তুমি আক্রান্ত অশ্লীলতার বিষাক্ত থাবায়।
তোমার আমালনামা মন্দ দিয়ে পূর্ণ। কিন্তু অন্তরের
তাওবাই মুছে দিতে পারে এই সব গুনাহ। কারণ,
তিনি ক্ষমাশীল। আমাদের গুনাহ পাহাড় সমান হয়ে
গেলেও তার ভারী বর্ষণ তা মুছে দিতে সক্ষম। তাই
আমাদের উচিত আজ থেকেই এইসব বর্বরতাকে
পিছনে ফেলে ফিরে আসা এই সুন্দর জগতে, হিফাজত
করা নিজের দৃষ্টিশক্তিকে, মেনে চলা আল্লাহর সকল
বিধি বিধান, নিজের যৌবনকে কাজে লাগিয়ে হয়ে
ওঠা আল্লাহর প্রিয় বান্দা।

আজ থেকেই এইসব মুভি, নাটক, ওয়েব সিরিজগুলোকে
বর্জন করা হোক। অন্তত রমাদান মাসকে উপলক্ষ করে
হলেও আমরা আজ থেকেই বিরত হওয়ার ব্রত গ্রহণ করি
এসব পাপাচার থেকে। আর সেই সাথে চেষ্টা চালাই
নিজেকে পরিশুন্দ করার। কেননা কুরআনে বলা আছে,
'যে আত্মশুন্দি করে, সে সফলকাম হয়।'[৩] সুতরাং,
বাঁচতে হবে নতুন পরিচয় নিয়ে। মেনে চলতে হবে
ইসলামের সকল বিধি-বিধান। যেখানে রয়েছে প্রশান্তি।
শুধু পৃথিবীতে নয় আখিরাতেও রয়েছে স্থায়ী শান্তি
জাগ্রাত।

তথ্যসূত্রঃ-

[১] সূরা হাশর (আয়াত ১৮)

[২] মুসাম্মাফে ইবনে আবী শাইবা (৩৪২১৬), সুনানে
তিরিমিয়ী (২৪৯৯), আল মুসতাদরাক আলাস
সহীহাইন; হাকিম (৭৬১৭)

[৩] সূরা শামস (আয়াত ৯)


রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি স্বচ্ছরিত্বান
থাকতে চায় আল্লাহ তা’আলা তাকে স্বচ্ছরিত্বান
রাখেন। যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকতে চায় আল্লাহ
তা’আলা তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন। যে ব্যক্তি
ধৈর্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ তা’আলা তাকে
ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করেন। আর
সবরের চাহিতে উত্তম ও প্রশংসন্ত কোনো দান
কাউকে দেয়া হয়নি।’

(সহীহ বুখারী, হাদিস নং -১৪৬৯)



সিয়াম

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার এক আধ্যাত্মিক রূপ

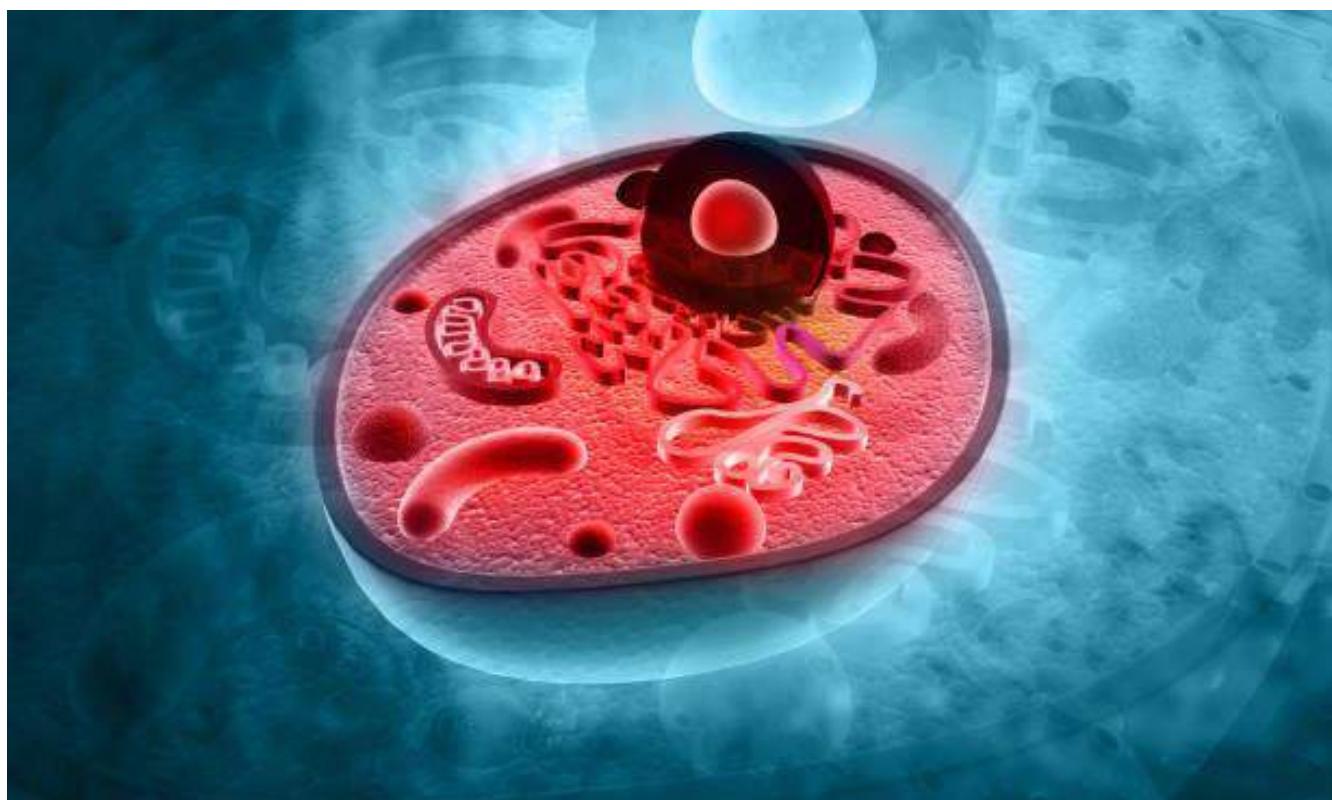
ফাহাদ হুসাইন, একাদশ শ্রেণি, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা।

বিশ্বের সিয়াম শুধু মুসলিম উম্মাহর উপরেই নয়, বরং বহু আগে থেকেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সিয়াম পালন আবশ্যিক করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর আদেশ হিসেবে এই দায়িত্ব আমরা অবশ্যই পালন করব। তবে, কুরআনের আদেশগুলোর বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাও আছে। আজ আমরা সেরকমই একটি দিক আলোচনা করব।

তোমরা সবাই শুনে থাকবে, আমাদের শরীরের গঠন ও কার্যাবলির একক হলো কোষ। অর্থাৎ, মানুষসহ যেকোনো জীবের দেহ অসংখ্য কোষ নিয়ে গঠিত। এই ক্ষুদ্র কোষে আবার অনেক অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অঙ্গগু থাকে। এরকমই একটি অঙ্গগুর নাম হলো- লাইসোজোম। এই লাইসোজোম মানবশরীরে কল্পনাতীত সুন্দর এবং সূক্ষ্ম কিছু কার্যসাধন করে। লাইসোজোমের বহু কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো- ‘অটোফ্যাগী’(Autophagy) সম্পাদনা করা। আর এই অটোফ্যাগী প্রক্রিয়াটি সিয়াম পালনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

লাইসোজোম হলো কোষের মধ্যকার একটি অতি ক্ষুদ্র অঙ্গগু যা এর মধ্যে হাইড্রোলাইটিক নামের একপ্রকার এনজাইম ধারণ করে। (এনজাইম সম্পর্কে পরে একদিন আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ)। এই এনজাইমটিকে তুমি বিশাল পদার্থের সঙ্গেও তুলনা করতে পারো। এই এনজাইম কোষীয় অন্যান্য অঙ্গগুসমূহকে প্রয়োজনের সময় ধ্রংস করে দিতে পারে।

আমরা প্রতিনিয়ত যখন খাদ্যগ্রহণ করি তখন আমাদের দেহের প্রতিটি কোষ তার প্রয়োজনীয় শক্তি আমাদেরই গ্রহণকৃত খাদ্য থেকে সংগ্রহ করে নেয়। এই তৈরিকৃত খাদ্যের পরিমাণ প্রায়শই তার প্রয়োজনের থেকে কিছুটা বেশি থাকে। তাই, কোষ তার এই অতিরিক্ত শক্তি বা শক্তি উপাদানসমূহ পাশের কোনো অসুস্থ কোষকে সরবরাহ করে তাকেও বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। (মানুষের যতরকম অসুখ-বিসুখ হয় তা মূলত কোষের অসুস্থতার কারণেই হয়ে থাকে। আমাদের কোষ পরিবেশের দ্বারা নানাভাবে অসুস্থ হয়ে থাকে। কখনো ভাইরাস আক্রান্ত, কখনো কেমিক্যাল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, টিউমার আক্রান্ত, কখনো সূর্যের অতিবেগে রশ্মি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কোষসমূহ অসুস্থ হয়)। সুস্থ কোষগুলো থেকে অসুস্থ কোষগুলো খাদ্য গ্রহণ করে; ক্লাইম্যাক্স এখানে না। ক্লাইম্যাক্স এখনো বাকি। রমাদানে বা



বছরের অন্যান্য সময়ে যখন আমরা না খেয়ে থাকি তখন আমাদের শরীরে কিছুটা খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এমতাবস্থায় সুস্থ কোষগুলো প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য ব্যবহার করে তার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি উৎপাদন করে ঠিকই কিন্তু অতিরিক্ত শক্তি উৎপাদনের সামর্থ্য আর থাকেনা তখন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পাশের অসুস্থ কোষগুলোতে আর উদ্বৃত্ত শক্তি সরবরাহ করতে পারেনা। অসুস্থ কোষ যেহেতু নিজে খাদ্য তৈরি করতে পারেনা, এমন পরিস্থিতিতে অসুস্থ কোষে তীব্র অস্ফীয় পরিবেশ তৈরি হয়। তীব্র অস্ফীয়ের কারণে লাইসোজোমের আবরণী তখন ল্যাবিলাইজার নামক বস্তু কারণে ফেটে যায় এবং এর ভেতরে সংরক্ষিত হাইড্রোলাইটিক এনজাইম বের করে দেয়। আর এই এইনজাইম বের হয়েই ওই অসুস্থ কোষটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। তবে অন্যান্য সুস্থ কোষে লাইসোজোম হাইড্রোলাইটিক এনজাইম মুক্ত করে ওই কোষের কোনো ক্ষতিসাধন করে না। সুস্থ কোষে লাইসোজোমের বিল্লি

বা আবরণীকে হিতি দান করে স্ট্যাবিলাইজার নামের বস্ত। এভাবে নিজের থলি ফাটিয়ে ধ্বংস প্রক্রিয়া সাধন করার কারণে লাইসোজোমকে বলা হয় ‘আত্মাতী থলিকা’(Suicidal Squad)। এইয়ে লাইসোজোম থেকে এই বিষাক্ত এনজাইমটি বের হয়ে অসুস্থ কোষটিকে ধ্বংস করে তোমার শরীরকে এক মহাবিপদ থেকে রক্ষা করলো- এই ঘটনাটিই হলো অটোফ্যাগী। আর অটোফ্যাগী যে প্রক্রিয়ায় ঘটে তাকে বলা হয় অটোলাইসিস।^[১] জাপানের একজন বিজ্ঞানী Yoshinori Oshumi দীর্ঘদিন শ্রমব্যয় করে লাইসোজোমের অটোফ্যাগী প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তিনি ইস্টের উপরে গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তার এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৬ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।^[২]

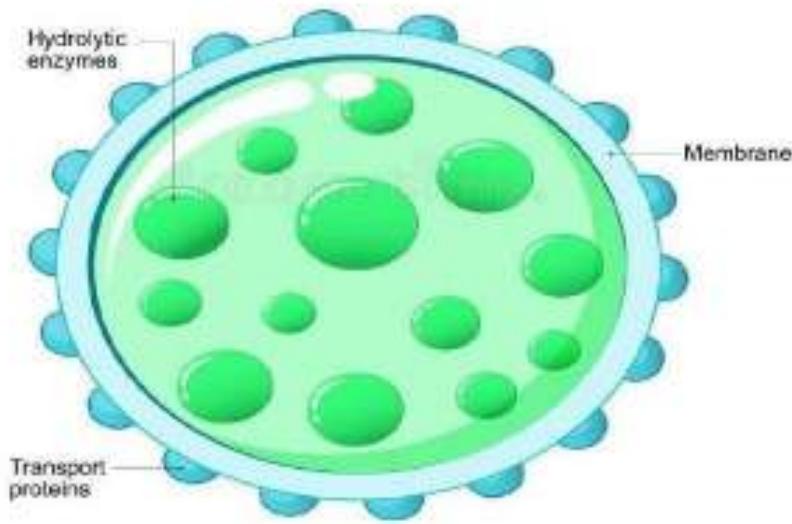
অটোফ্যাগী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের দেহ নানাবিধ রোগ থেকে মুক্তি পায়। অতিরিক্ত মেদ হ্রাস, ইনসুলিনের পরিমাণের সাম্য রক্ষা, এলার্জি থেকে মুক্তি ও শরীরের ইমিউন সিস্টেম সক্রিয় করতে অটোফ্যাগী বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও কার্যকরী একটি পদ্ধতিতে পরিগত হয়েছে। মুসলিম বাদেও নানা ধর্মাবলম্বীরা এখন রোগ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে না খেয়ে থেকে বা ওয়াটার ফাস্টিং করে শরীরের অটোলাইসিস প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছেন।

ভাবতেই অবাক লাগে, যেই হৃকুম বা আদেশ আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য দীর্ঘ ১৪০০ বছর বরং তারও বেশি সময় ধরে পালন করে আসছি আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকে। আজ সেই আধ্যাত্মিকতাই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়ে বৈজ্ঞানিক রূপ ধারণ করে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে। এটি মনে করিয়ে দেয় কুরআনের সেই আয়াত-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمْ أَلْسُنَمْ بِيَنَا

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম; আর তোমাদের জন্য ইসলামকে ধীন হিসেবে পছন্দ করলাম।[সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: -৩] হে আল্লাহ! আমাদের সকলের রমাদানকে বরকতময় করে দিন এবং আমাদেরকে বিশুদ্ধ আমল করার তাওফিক দান করুন।(আমিন)

LYSOSOME



[১] উচ্চমাধ্যমিক জীববিজ্ঞান(১ম পত্র), ২০২০ সংস্করণ, ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান। (পৃষ্ঠা: ১৭-১৮)

[২] <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2016/press-release/>

[৩]ছবি সূত্র:dreamstime.com

আলোর পথের সহজ সমীকরণ

আরমান আব্দুল্লাহ সাকিব



আমাদের গণিতের শিক্ষক রইসুদ্দিন আহমেদ। যার নাম শুনলেই ছাত্রদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা একেবারেই আসম। রঞ্জিন ঘোষণা হয়ে গেছে; সামনে মাস থেকেই পরীক্ষা। দ্বিতীয় পিরিয়ডে সালাম দিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করলেন রইসুদ্দিন স্যার। ক্লাসে পিনপতন নীরবতা। তিনি সবার দিকে একবার চোখ ঝুলিয়ে বসে পড়লেন। স্যার খুব শান্ত কঢ়ে সবাইকে গণিত বই বের করতে বললেন। সবার বই বের করা হলে তিনি বলতে আরম্ভ করলেনঃ

- আজকে তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষার জন্য সাজেশন দেয়া হবে। সাজেশনটি তোমরা অনুসরণ করলে একশতে একশ পাবে।

স্যারের কথা শুনে আমরা একে অপরের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলাম। রইসুদ্দিন স্যারের প্রশ্ন মানেই পাশ নিয়ে টানাটানি; সেখানে ফুল মার্কস পাওয়া একেবারেই আকাশকুসুম চিন্তাভাবনা। বোর্ড পরীক্ষায় প্রথম হওয়া আমাদের স্কুলের ক্রিচ্ছাত্র নিয়াজ গণিতে পেয়েছিল রেকর্ড করা সর্বোচ্চ ৯৩ নাম্বার, সেটাও বছর ছ'য়েক আগের ঘটনা। রইসুদ্দিন স্যার বেশ রাগী মানুষ, তাই কেউ আর টু শব্দ করলো না, স্যারের নির্দেশগুলো নীরবে শুনতে শুরু করলো, স্যার প্রতিটি অধ্যায় থেকে সাজেশন দিচ্ছেন। নবম অধ্যায়ে এসে একটু থামলেন। বইয়ের দিকেই চোখ রেখে বললেনঃ

- এই অধ্যায়টি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ের ১০ টি অংক যদি তোমরা কর অবশ্যই ৩০ মার্ক পেয়ে যাবে।

আহ! এ যেনো সরাসরি প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত অবস্থা। ১০ টা অংক করলেই ৩০% মার্ক নিশ্চিত। ক্লাস শেষ হলো, প্রতিটি ছাত্রই আজকের ক্লাসে খুব খুশি। খুশিমনে সবাই বাড়ি ফিরে পরীক্ষার পূর্ণপ্রস্তুতি নিতে থাকলো যেন পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার পাওয়া যায়।

আমাদের মানবজাতির জন্য দুনিয়াও হচ্ছে এমন একটি পরীক্ষার জায়গা। দুনিয়ায় আমাদের কর্ম অনুযায়ী আখিরাতে ফলাফল দেয়া হবে। যারা উক্ত পরীক্ষায় উন্নীত হবে, তারাই হবে সফলকাম। অর্থাৎ তারা চিরস্থায়ী জান্মাতে বিচরণ করবে। আর যারা অনুভূর্ণ হবে তাদের জন্য থাকবে কঠিন আয়াবের স্থান, জাহানাম! আচ্ছা একটু চিন্তা করো, কেমন হতো যদি ক্লাসের পরীক্ষার মতো দুনিয়ার কঠিন পরীক্ষার প্রশ্নও আগে থেকেই নিশ্চিত সাজেশন হিসেবে পেয়ে যেতাম! কিংবা আমাদের সুযোগ থাকতো আমাদের পরীক্ষার খাতা নিশ্চিত নির্ভুল করার! হ্যাঁ, প্রিয় বন্ধুরা, এমনটাই কিন্তু হয়েছে দুনিয়ার পরীক্ষাতেও কিন্তু আমরা জানি না বা অনুধাবন করতে পারিনি। চলো বিষয়টি অনুধাবনের জন্য আমরা কিছু তথ্য জেনে নেই।

হিজরী ক্যালেন্ডার অনুসারে বছরে মোট বারোটি মাসে। এরমধ্যে একটি মাসের নাম 'রমাদান'। আমাদের প্রত্যাহিক পাপের দরংণ আমাদের আমলনামা পাপে পূর্ণ হয়ে যায়, আমাদের নফস হয়ে যায় গুনাহের প্রতি আসক্ত। এই অবস্থা থেকে উদ্বারের জন্য আমাদের প্রিয় রব আমাদের জন্য 'রমাদান' নামক একটি ব্যবস্থা রেখেছেন। যদি আমরা এই মাসের যথোপযুক্ত কদর করি, তাহলে অবশ্যই আমাদের সকল পাপ ধূয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের দুনিয়া নামক পরীক্ষাতেও আমরা উত্তীর্ণ হতে পারবো। যেমনটি আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমাদান মাসের সিয়াম পালন করবে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"^[১]

আহ! কি সুর্ণ সুযোগ, তোমার বার্ষিক পরীক্ষা কিংবা দুনিয়াবি যে কোনো পরীক্ষায় কি এমন সুযোগ পাওয়া যাবে? শুধু তাই নয়, দেখো আমাদের রব আমাদের কত ভালোবাসেন। তিনি সিয়াম পালনকারীকে নিজে প্রতিদান দিবেন! যেমনটি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার প্রিয় রাসূল ﷺ এর মাধ্যমে জানিয়েছেন,

"সিয়াম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেবো।"^[২] ভাবতে পারো সারা জাহানের মালিক, অধিপতি আমাদের নিজ হাতে প্রতিদান দিবেন; যেখানে স্কুলের সামান্য প্রধান শিক্ষক পুরস্কার দিলে আমরা কত খুশি হয়ে যাই। আহ! না জানি কেমন হবে মহান রবের সে প্রতিদান।

প্রিয় বন্ধুরা এখানেই শেষ নয়, আমাদের রব চান আমরা যেন সহজেই নাজাতের সুযোগ পাই। এজন্য তিনি তার পবিত্র কালামের সূরা কদরে আমাদের জানিয়েছেন, রমাদান মাসের একটি রাত রয়েছে, যে রাত হাজার মাস থেকেও উত্তম। ভেবে দেখোতো, আমাদের গড় আয় যেখানে শত বছরও নয়; সেখানে একটি রাত্রিই হাজার মাস থেকে উত্তম! সুবহানাল্লাহ!!

আবার এই নির্দিষ্ট রাতকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ এর মাধ্যমে আরো সহজ করে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা রমাদানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাত্রিগুলোতে কদরের রাত খোঁজ করো।"^[৩] মাত্র পাঁচ রাত্রি ইবাদতে হাজার মাস থেকে বেশি ইবাদত করার সওয়াব। আমরা যদি আমাদের হায়াতে পঞ্চাশটি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই, তাহলে কত-শত বছর হবে! মহান রবের এমন অজস্র নিয়ামতের কথা চিন্তা করলেই প্রাণটা ভরে যায়।

মহান রবের আরেকটি নিয়ামতের কথা না বললেই নয়। এ রমাদান মাসে মহান রব্বুল আলামিন আমাদের প্রকাশ্য শক্ত ইবলিশকে আটকে রাখেন। জাহানামের দরজা বন্ধ করে দেন, রহমতের দরজা খুলেন দেন।^[৪] এছাড়া এ মাসে দান করার ফয়লত অন্যান্য যেকোনো মাস থেকে অনেক বেশি।

প্রিয় বন্ধুরা একটু চিন্তা করে দেখো, আমাদের রব আমাদের জন্য কত সহজ করে দিয়েছেন। আমাদের

জন্য কত বড় সুযোগ দিয়েছেন আমাদের পরীক্ষার খাতা অর্থাৎ আমলের খাতা ভারি করার জন্য। সুযোগ দিয়েছেন "লাইলাতুল কদর" নামক বিশেষ এক রাত্রিতে ইবাদত করার। এতে সুযোগ আর সওয়াবের কথা চিন্তা করে তোমাদের সবারও মন নিশ্চয়ই আনন্দে -উৎফুল্ল, তাই না?

তাহলে এখন কিন্তু আমাদের মাত্র একটি কাজ বাকি সেটি হচ্ছে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রমাদান মাসে পূর্ণভাবে আমল করা। যেনে আমরা আমাদের কাজিন্ত ফলাফল "জান্নাতুল ফেরদৌস"-এ স্থান করে নিতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। রমাদানের নেয়ামতে পূর্ণ হোক আমাদের ইহকাল; এর পূর্ণতা পাক জান্নাতের "রাইয়ান" নামক দরজায়। আমীন।

**ভাবতে পারো
সারা জাহানের
মালিক,
অধিপতি
আমাদের নিজ
হাতে প্রতিদান
দিবেন; যেখানে
স্কুলের সামান্য
প্রধান শিক্ষক
পুরস্কার দিলে
আমরা কত
খুশি হয়ে যাই।
আহ! না জানি
কেমন হবে
মহান রবের সে
প্রতিদান।**

তথ্যসূত্র:

১. সহীহ বুখারী (৩৮), সহীহ মুসলিম (৭৬০)
২. সহীহ বুখারী (৭৪৯২), সহীহ মুসলিম (১১৫১)
৩. সহীহ বুখারী (২০১৭)
৪. সহীহ মুসলিম (১০৭৯), সুনানে তিরমিয়ী (৬৮২), সহীহ ইবনে খুয়াইমা (১৮৮৩), সহীহ ইবনে হিরান (৩৪৩৫)

ভ্যাকসিন মন্দাচার

সিদ্ধি কুর রহমান



আসরের সালাতের পর দূর থেকে আমাকে দেখেই দৌড়ে
এসে 'বিরাট সংবাদ' টি জানালো ইফতি। কি এমন সংবাদ
যেটা জানাতে এমন হস্তদণ্ড হয়ে ছুটতে হবে? ইফতিদের
পরিবারে নতুন মুখ যুক্ত হয়েছে। ছোট একটা ভাই হয়েছে
ওর গতকাল। শুনে বললাম:

- আলহামদুলিল্লাহ, এ তো খুবই খুশির খবর! মিষ্টি
খাওয়াচ্ছা কবে?
- ইনশা আল্লাহ ভাইয়া, খাওয়াবো। কিন্তু ভাইয়া একটা
সমস্যা; হাসপাতাল থেকে বাসায় আসার পর রাত
থেকেই ওর জ্বর। আশ্মু বলছিল টিকা দেওয়ার কারণে
নাকি জ্বর আসতে পারে!

আমি এক গাল হেসে ইফতিকে অভয় দিয়ে বললাম :

- 'হ্যাঁ, সামান্য জ্বর তো আসতেই পারে, তবে ও কিছুনা।
ইনশা আল্লাহ এমনিতেই সেরে যাবে!
- অহ, কিন্তু ভাইয়া একটা জিনিস কিছুতেই মাথায় ঢুকছেন।
জ্বরটা আসবে কেন? টিকা তো দেয়াই হয় রোগ থেকে
রেহাই পেতে। সেই টিকার প্রভাবেই কিনা আবার জ্বর
আসতে পারে। পুরোই অঙ্গুত!

ভাইয়া-আপুরা, তোমরাও কি ইফতির মত ব্যাপারটা নিয়ে
চিন্তা করেছো কখনো? তাহলে চলো ঝটপট জেনে ফেলি
টিকা বা ভ্যাকসিন নিয়ে কিছু প্রাথমিক কথাবার্তা। তার

আগে একটা ছোট্ট গল্প বলি, শোনো...

একটা রাজ্য ছিলো। ছবির মতো সুন্দর সেই রাজ্যে
মানুষগুলোও সুখী। তো সেই রাজ্যে একবার একটা খবর
এলো। ভিন্দেশী অচেনা শক্ররা রাজ্যের দিকে এগিয়ে
আসছে। রাজ্যের অদূরেই তারা ক্যাম্প করেছে। তাদের
উদ্দেশ্য রাজ্য দখল করা। রাজ্যের সুখে সুখী মানুষ গুলো
হঠাতে চিন্তায় পড়ে গেল।

তবে রাজামশাই চিন্তিত হলেন না। কারণ সেই রাজ্যের ছিল
একদল ডেডিকেটেড সেনাবাহিনী, যারা সব সময় প্রাণপণ
লড়াই করে বহিঃশক্তির হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষা করতে
দৃঢ় প্রত্যয়ী। কিন্তু সমস্যাটা হলো এবারের শক্রবাহিনী
সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাদের ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না
এই সেনাবাহিনীর। রাজ্যের চিন্তায় পেরেশান রাজা একটা
পরিকল্পনা হাতে নিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন সৈন্যদের
ট্রেনিং দরকার যেখানে ভিন্দেশের শক্রবাহিনীর গঠন
বিন্যাস, সামর্থ্য ও দুর্বলতা সহ খুঁটিনাটি সম্পর্কে তাদের
পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু শক্রবাহিনীর এই গোপন
তথ্যগুলো কোথায় পাওয়া যায়?

এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন রাজ্যের রাজপুত্র।
রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে তিনি দু-তিনজন সেনা সদস্যসহ
বেরিয়ে পড়লেন। খুব গোপনে শক্র শিবিরের পাশে ঝোঁপের
আড়ালটায় ওঁত পেতে থাকলেন। তাদের উদ্দেশ্য হলো
শক্রপক্ষের কোন সদস্য প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ঝোঁপের

এদিকটায় এলেই তাকে আটক করা। এবং শেষমেষ সত্ত্ব সত্যিই শক্রদলের একজন সেনাকে তারা আটক করতে সক্ষম হলেন। ব্যাস! কেল্লাফতে!

আটককৃত শক্রসেনাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে রাজ দরবারে হাজির করা হলো এবং তার থেকেই শক্রদলের নাড়ি-নক্ষত্র, শক্তিমন্ত্র-দুর্বলতার খুঁটিনাটি সব তথ্য পাওয়া গেলো। রাজ্যের সেনাবাহিনী এখন শক্রর মোকাবেলা করতে একদম প্রস্তুত!

ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামে অসম্ভব সুন্দর একটি ব্যবস্থা রাখুল আলামিন আমাদের দেহে ইপটল করে দিয়েছেন। এই সিস্টেম কেবলমাত্র তোমার দেহের নিজস্ব কলকজা (!) গুলোকে চেনে। এর বাইরের বাকি সবাইকে সে ভিন্নদেশী শক্র হিসেবে গণ্য করে। এবং তাদেরকে মোটেই allow করে না। এরা এতটাই ডেডিকেটেড!

একারণেই যখন তোমার শরীরের কোন জীবাণু প্রবেশ করে- সাথে সাথেই তোমার ইমিউন সিস্টেম সেই জীবাণু কে প্রতিহত করার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। অনেকটা সেই রাজ্যের সেনাবাহিনীর মতো। জীবাণুর এন্টিজেন এর বিরুদ্ধে তোমার দেহে তখন তৈরি হয়-এন্টিবডি নামক অস্ত্র, যা জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলে।

তবে এই প্রসেসটা কখনো কখনো একটু সময় সাপেক্ষ হয়। কারণ জীবাণু তোমার শরীরে প্রবেশের পর সেই জীবাণুর আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করে তার বিরুদ্ধে মোক্ষম অস্ত্রটি (এন্টিবডি) তৈরি করতে একটু তো সময় লাগবেই।

আচ্ছা! কেমন হয় যদি আমরা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে আগে থেকেই জীবাণুর চেহারা-সুরত এর সাথে পরিচয় করিয়ে রাখি? ওই যে সেই রাজ্যের রাজার মতো, যিনি কিনা শক্রের আক্রমণের আগেই গোটা শক্রদল সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ বন্ধুরা, ভ্যাকসিনের মূল রহস্যটা

এখানেই। তোমরা জেনে হয়তো অবাক হবে- ভ্যাকসিন কিন্তু আসলে নিষ্ক্রিয় জীবাণু কিংবা জীবাণুর অংশবিশেষ! যেটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় যাতে করে আমাদের দেহের সেনাবাহিনী (ইমিউন সিস্টেম) এই জীবাণুটি কে চিনে রাখে এবং এর পরবর্তীতে দুষ্ট জীবাণুটির সক্রিয় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকে। যেমনটা আমরা গল্লে দেখলাম- গোয়েন্দা মাধ্যমে এক শক্রসেনাকে ব্যবহার করেই গোটা শক্র দলকে পরাজিত করার মূলমন্ত্র রচিত হয়েছিল।

অতি অবশ্যই ভ্যাকসিন এর মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো জীবাণুটি হয়- মৃত জীবাণু কিংবা অর্ধমৃত, অথবা রোগ সংক্রমণে অক্ষম, অথবা জীবাণুর সামান্য অংশবিশেষ। যাকে আমরা আদর করে ডাকতে পারি- মূর্খ জীবাণু!

যেই মূর্খ জীবাণু আমাদের দেহে কোন রোগ সৃষ্টি করতে পারবে না বরং আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে জানিয়ে দেবে জীবাণুর বিরুদ্ধে কেমন করে লড়াই করতে হয়।

তোমরা কি এখন বুঝতে পারছো ভ্যাকসিন নিলে সামান্য জ্বর কেন আসতে পারে?

ব্যাপারটা একেবারেই সহজ। ভ্যাকসিন নামক 'মূর্খ জীবাণু' টি শরীরে প্রবেশ করানোর পর তাকে উত্তম মধ্যম দেয়ার জন্য তোমার শরীরে জীবাণুর অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে শুরু করে। সেগুলোই পরবর্তীতে অ্যান্টিজেনের সাথে রিঅ্যাকশন করে। যার ফলশ্রুতিতে সামান্য জ্বর, ব্যথা কিংবা ফুলে যাওয়া এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। তবে সবারই যে জ্বর আসবে এমনটাও নয়।

আমরা এখানে কেবল ভ্যাকসিন সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথা বললাম। তোমাদের মনে নিশ্চয়ই আরো অনেক প্রশ্ন জমে গেছে..

দেরি না করে বাটপট প্রশ্ন গুলো পাঠিয়ে দাও আমাদের ডাক্তারখানায়। তোমাদের চিঠির অপেক্ষায় রইলাম কিন্তু...



ঈদ

আহমেদ হাসাইন

আমার নাম সোহান। এই বাজারের পাশে আমি থাকি। আর আমার বাড়ি সুনামগঞ্জ। আমার একটা ছোট বোন আছে ও একটা ছোট ভাই ছিল। আর বাবা-মারে নিয়া ছিল সুখের পরিবার। আমাদের গোলা ভরা ধান, পুরু ভরা মাছ ছিলো। গ্রামের ক্ষুলে জেএসসি তে ভালো পাশ কইরা আমি এখন নাইনে ছিলাম। প্রত্যেকবারই আমাদের গ্রামে বন্যা হয়।

কিন্তু গতবারের বন্যায় আমার জীবন পাল্টাইয়া গেছে। ঠিক কইরা ধান গুলা পাকার আগেই বন্যা হইয়া সব নষ্ট হইয়া গেছে। গরু-ছাগল রোপে মারা গেল। শুরু হইলো পরিবারের অভাব-অন্টন। তিনি বেলা ঠিক মতো খাইতে কষ্ট হইয়া যায়। তারপরেও এই নিয়া দিন ভালোই কাটাছিলো। কিন্তু এক রাইতে তখনও আরো ঘরে ফিরে নাই। আমার আরো ছিল এলাকার একজন ভালো লোক। তারপর সেই রাইতে শুরু হয় বিরাট ঝড়। আমাগো টিনের ঘরটাই আমি, আমার বোন, মা ও আমার ছোট-ভাই লগেই ছিলাম। ঝড়ে রান্না ঘর উইঢ়া আমাগো ঘরের উপরে পড়ে। ছোট বোনটারে হাতে ধইরা আমি বাইরাইয়া গেলাম। কিন্তু মা ছোট ভাইটারে নিয়া বাইরাইতে পারলোনা। দুনিয়া থেইকা মাও চইলা গেল। আদর করার মত আর খালি আরো থাকল। গ্রামের চারদিকে মানুষের খালি অভাব আর অভাব। তাই আরো আমাগোরে লইয়া শহরে আইয়া পড়ল। আরো একটা

রিক্ত ভাড়া লইয়া চালায়। আর আমি এই বাজারে চায়ের দোকানে কাজ করি। ঘরের রান্না আর বোইনেরে দেখাশুনা করি আমি। তাই আমার পড়া লেখা এখন বন্ধ।

সোহানের কথা গুলো শুনে চোখের কিনারায় পানি চলে আসলো। কত কষ্টের জীবন ওর। আবার জিজেস করলাম, এবার রোজা কিভাবে কাটালে? ও বলল, ‘রোজা তো মুটামুটি কাটাইছি। মাঝে এমনও দিন গেছে পানি খাইয়া রোজা রাখছি আবার পানি দিয়াই ইফতারি করছি।’ কথা শুনে বিবেক নাড়া দিয়ে উঠল। কষ্টের কালো মেঘ মনে গিয়ে পাড়ি জমালো।

অন্য দিকে,

কাল ঈদ। এজন্য বাজারের ছেলেরা আনন্দে মেতে উঠচে। ডেক সেটে গান বাজিয়ে নাচানাচি করছে। আবার আতশবাজি, চকলেট বোমা ফাটাচ্ছে। দেখতে দেখতে মনে মনে ভাবলাম এভাবে কত ছেলে-মেয়ে ঈদে আনন্দ করতে পারছে না। এটা আমরা কজনইবা ভেবেছি? এজন্য মনেমনে সিদ্ধান্ত নিলাম আর কিছু না পারি অতত নিজের এলাকার গরিব ছেলেগুলোর সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে এবার ঈদ কাটাবো।



ପୁଲି ମ୍ରଧନ ଟୋର୍ଡ୍

ଅଗ୍ରତ୍ତ ଗୋଲି ଗୋଶତ୍ରାଷ

କଲ୍ଲୋଲ ଜିଗ୍ଯେସ କରଲ, ‘ଆଛା, ଆମରା ଓମର ରାଯିଯାଙ୍ଗାରୁ ଆନହର ମୁସଲିମ ହୋଯାର ଘଟନାଟା ଜାନି; କିନ୍ତୁ ତିନି ସଖନ ମୁସଲିମ ଛିଲେନ ନା, ତଥନ କେମନ ଛିଲେନ? ମୁସଲିମ ତୋ ଆରା ଅନେକେଇ ହେଁଥେ; କିନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ପର୍କେ ଏତ ଆଲୋଚନା ହୋଯାର କାରଣ କୀ?’

ଏକଜନ କିଶୋରର ଏହି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଠ ପ୍ରକ୍ଷଣ ଆମାକେ ଯତଟା ମୁଞ୍ଚ କରଲ, ସେ ଏକଜନ ଅମୁସଲିମ ହିସେବେ ଇସଲାମେର ଇତିହାସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୋର୍ଦୋଷ ପ୍ରତାପଶାଲୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଓମର ରାଯିଯାଙ୍ଗାରୁ ଆନହର ଅମୁସଲିମ ଜୀବନ ଜାନତେ ଚାଚେ—କୋନ ଜୀବନ ଥେକେ ତିନି ଆଲୋତେ ଏସେହେନ—ଏହି ଜାନତେ ଚାଓୟାଟା ଆମାକେ ବିଶେଷ ଆଶାସ୍ତିତ କରଲ ।

ଆଗେଇ ବଲେଛି ତୋମାଦେର, କଲ୍ଲୋଲ ଦାଶେର ସଙ୍ଗେ ଏହି ଆଲାପେ ଆମରା ଛିଲାମ ତିନଜନ । ଆମି ଆର ଖାଲିଦ ଛିଲାମ ଛୋଟୋ, ମାଦରାସାର ନିଚେର ଜାମାତେ ପଡ଼ି ତଥନ । ଓପରେର ଜାମାତେର ଏକଜନ ବଡ଼ଭାଇ ଛିଲେନ ତିନଜନେର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜାମାତେର ଆମିର । ଯେମନ ତାର ଉଚ୍ଚତା, ଚତୁର୍ବା ବୁକ, ଗାୟେ ଲସା ଜୁର୍ବା, ଗାଲଭରା ଦାଡ଼ି, ମାଥାଯ ସାଦା ପାଗଡ଼ି—ଏକଜନ ସତ୍ୟକାରେର ପୁରୁଷ ଦେଖିତେ ଯେମନ ହ୍ୟ । ଆମି ଆର ଖାଲିଦ ଯେହେତୁ ଛୋଟୋ, ବୈଶିରଭାଗ ପ୍ରଶ୍ନେର ଉତ୍ତର ତିନିଇ ଦିଛିଲେନ, ଆମରା ମାବୋମଧ୍ୟେ ତାର କଥାଯ ସାଯ ଦିଛି, ଛୁଟେ ଯାଓୟା ଦୁ-ଏକଟି କଥା ଆମରା ଯା ଜାନି; ତାର ମୁଖେ ତୁଳେ ଦିଛି ।

କଲ୍ଲୋଲ ଦାଶ ଓମର ରାଯିଯାଙ୍ଗାରୁ ଆନହର ଅମୁସଲିମ-ଜୀବନ ଜାନତେ ଚାଓୟାଯ ତିନି ସ୍ମିତ ହାସଲେନ । ଆମାର ମନେ ଆଛେ,

ଶାଦା ଜୁର୍ବା, ସାଦା ପାଗଡ଼ି, ଗାଲଭରା ଦାଡ଼ିତେ ତାର ସେଇ ହାସି ଅପୂର୍ବ ଲାଗଛିଲ । ଉତ୍ତର ଦିତେ ତିନି ସମୟ ନିଲେନ ନା । ଆମି ଆର ଖାଲିଦଓ ଜୁଡେ ଗେଲାମ ସଙ୍ଗେ ।

ଆମି ତୁମି ଆମରା ‘ଘୋଲୋ’-ଟିନେଜଦେର ମତୋ ଓମର ରାଯିଯାଙ୍ଗାରୁ ଆନହତ ଏକସମୟ କିଶୋର ଛିଲେନ । ଖୁବ କଟେ କେଟେଛିଲ ତାର ସେଇ ବୟସଟା । କଥନୋ ତିନି ଉଟେର ରାଖାଲ, କଥନୋ କୁଡ଼ାତେ ହେଁଥେ ଜ୍ଞାଲାନି କାଠ,^[୧] ଆବାର ପରିଣତ ବୟସେ ଛିଲେନ ବ୍ୟବସାଯିକ ମୁସାଫିର—ପ୍ରଚୁର ଖାଟୁନେ ଏକଜନ ମାନୁଷ । ତାର ବାବା ଖାତାବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗୀ ମାନୁଷ ଛିଲେନ; ତାକେ ଇଚ୍ଛାମତୋ ଖାଟାତେନ, କାଜ କରତେ ନା ପାରଲେ ମାରଧର କରତେନ ।^[୨] ଶୁଦ୍ଧ ନିଜେଦେର ନା, ବନୁ ମାଖୟୁମ ଗୋତ୍ରେ ତାର ଖାଲାର ଗବାଦି ପଣ୍ଡତ ତାକେ ଚଢାତେ ହତୋ—ବିନିମୟେ ପେତେନ ଖେଜୁର ଆର କିସମିସ ।^[୩]

ତବେ ଆର ଦଶଜନ ବାଲକେର ମତୋ ତିନିଓ କିଶୋରେ ସ୍ଵଭାବଜାତ ଉଚ୍ଚଲତାୟ ମୁଖର ଛିଲେନ । ଖେଳାଧୁଲା କରତେନ । ଘୋଡ଼ା ଚାଲାନୋ ଜାନତେନ । ବୀରେରା ଯେମନ ହ୍ୟ ଆରକି; ଅଥବା ସେ ସମୟଟାର ଖେଳା-ଇ ଛିଲ ଘୋଡ଼ଦୌଡ଼, ତୀର-ବାଜି, ତଳୋଯାର ଲଡ଼ାଇ ଇତ୍ୟାଦି ।

ମାନୁଷେର ଜୀବନ ଏକଥାତେ ପ୍ରବାହିତ ହ୍ୟ ନା । କିଶୋରେର ସାଧାରଣ ରାଖାଲ ଆର ଜ୍ଞାଲାନିର ଯୋଗାନଦାତା ଓମର ପରିଣତ ବୟସେ ବ୍ୟବସାର ମାଧ୍ୟମେ ଏକଜନ ଆର୍ଥିକ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି-ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହନ । ମାବୋମଧ୍ୟେ ପଣ୍ୟ ନିଯେ ବାଣିଜ୍ୟ-ସଫର କରତେନ । ମେଲାଗୁଲୋତେ ସାଜିଯେ ବସତେନ ପଣ୍ୟେର ପସରା ।

এভাবে উট ও ছাগল চড়ানোর মাধ্যমে যেমন তার দৈর্ঘ্যের অনুশীলন হয়েছে, ব্যবসা করে হয়েছেন মক্কার সেরা ধনীদের একজন।

ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহু যে সময়কার, খুব অল্প মানুষ তখন লেখাপড়া জানতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ, নির্মাণ-ধ্বংস, ব্যবসায়িক যাত্রাসহ বিভিন্ন কাজে তারা ব্যস্ত থাকত। এখনকার মতো এত সুপরিকল্পিত জেলায় জেলায়, থানায় থানায়, গ্রামে গ্রামে—তাদের হিসেবে গোত্রে গোত্রে, অঞ্চলে অঞ্চলে স্কুল-মাদরাসা ছিল না। সঙ্গত কারণেই যারা লেখাপড়া জানতেন, তাদের বেশ কদর ছিল। ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহু সেই গুটিকয়েক বিদ্যানদের একজন। তিনি কবিতা পছন্দ করতেন, ইতিহাস শুনতে জানতে আনন্দ পেতেন।^[৪] সেই সময়ে আরবে বিভিন্ন মেলা হতো। আমাদের যেমন এখন বৈশাখী মেলা হয়, বাণিজ্য মেলা হয়, আরবেও তখন মেলা হতো—উকায়ের মেলা, যুল মাজায়ের মেলা; আরও কত কী! মেলায় শুধু বেচাবিক্রিই হতো না, নানান আসরও বসেতো। বাকপটুরা কিছা-কাহিনীর ডালি সাজিয়ে বসে মানুষকে মনোরঞ্জন দিত। ইতিহাস-জানা ব্যক্তিরা তাদের বিদ্যার ঝুলি খুলে বসতো। ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহু সেসব মেলায় বসতেন তার দোকানপাতি সাজিয়ে। এই সুবাদেই তিনি সেই ইতিহাস-কথকদের মুখ থেকে নানান দেশের অসংখ্য বীরের বিভিন্ন সংস্কৃতির বিবরণ শুনতে পেতেন। তিনি নিজে লেখাপড়া জানা মানুষ, নিজের বুদ্ধিতে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ব্যক্তি; সুতরাং ইতিহাস বর্ণনার এই আসরগুলো তাকে যেমন আরও সমৃদ্ধ করত, নিজেদের অতীত বীরত্ব ঐতিহ্য কলহ ও উন্নত্যও মনের ভেতর শক্তভাবে গেঁড়ে যেত।

কৈশোরের খাটুনে রাখালটিই শিক্ষা এবং সে অনুযায়ী বুদ্ধির কল্যাণে পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন পরম সম্মানের পাত্র। যেকোনো বিষয় তিনি ঠাড়ামাথায় সহজে বোঝাতে পারতেন। কুরাইশের সঙ্গে কারও বাক-বিতঙ্গ অথবা বনিবনার ব্যাপার ঘটলে সবাই মিলে ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহুকে পাঠাতেন তাদের হয়ে আলোচনা করার জন্য। তিনি ঠিক সময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কথা বলায় পটু ছিলেন। প্রচণ্ড ধৈর্যশীল ছিলেন।

সব মিলিয়ে স্পষ্ট হলো, শৈশব বা ‘ঘোলো’ থেকেই ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহু খুব পরিশ্রমী ছিলেন; আয়েশে আলসে তার সময় কাটেন। লেখাপড়া জানতেন। গুচ্ছিয়ে কথা বলার ওস্তাদ ছিলেন। জাহিলি কাল থেকেই কুরাইশদের মাঝে তিনি একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। সঙ্গত কারণেই অন্যরা এমন ব্যক্তিদের অনুসরণ করে। তাদের দেখে উৎসাহ পায়। ওমর রায়িয়াল্লাহু

আনহুরও কাজে বিচক্ষণতায় উদ্যমে দক্ষতায় সেকালে আরবের মানুষেরা তাকে খুব পছন্দ করত; কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এত এত যোগ্যতা আর খ্যাতিও ইতিহাসে তাকে আলোচিত রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল না। আরও কত কত যোগ্য দক্ষ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি গত হয়েছেন, সবার খোঁজ কি আমরা জানি? আজ তুমি একজন ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ হয়েও আগ্রহ নিয়ে তাকে জানতে চাচ্ছো, এটা কেন, জানো? কেবলই তার ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া পরবর্তী জীবনের কল্যাণে। দেখো ক঳িল, নবীদের পরে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন সাহাবিরা। তাদের কিশোররা বাদে বেশিরভাগই কিন্তু পৈতৃক সূত্রে মুসলমান ছিলেন না। কাফির ছিলেন; আল্লাহকে শুধু অস্থীকারই করেননি, অনেকে মুসলমানদের ধরে ধরে নির্যাতন করেছেন। ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন তাদের একজন। একবার তো এক দাসীকে মারতে মারতে নিজেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলেন। সেই ওমর যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, একেবারে দুধের শিশুর মতো পবিত্র হয়ে গেলেন। অতীতের সমস্ত পাপ মুছে সাফ হয়ে গেল। খালিদ বিল ওয়ালিদ, ইকরিমা বিন আবি জাহিলসহ কত কত ব্যক্তিত্ব কুফুরের অন্ধকারে ডুবে থেকে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল; তারপর মন থেকে দীমান এনে হয়ে গিয়েছিলেন পৃথিবী-সেরাদের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র হবার এই সুযোগ এখনো আছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দীমান এনে ইসলামে দাখিল হওয়া এমন এক ডিস-ইনফেকশনার, কুফুরির কঠিন জীবনুকেও ধুয়ে-মুছে সাফ করে ফেলে।

আমরা কথা বলছি আর ক঳িলের মায়ের মুখভঙ্গি খেয়ালে রাখার চেষ্টা করছি। নারীর মন বড় বিচ্ছি—আমাদের আলোচনায় হয়ত তিনি গলে যাবেন; অথবা ফুঁসে উঠবেন। দিতীয়টা হলে ক঳িলের কপালে দুর্গতি নেমে আসতে পারে। তিনি দ্রুত হাতে নারকোল কোড়াচ্ছেন আর একটু পর পর মাথা তুলে আমাদের দেখছেন। আমরা লক্ষ করলাম, ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহুর গঁসে ক঳িলের মতো তারও ঠেঁটের কেনায় নরম হাসি ফুটে উঠেছে। (চলবে, ইনশাআল্লাহ)

[১] তারীখে দিমাশক; ইবনে ‘আসাকির ৪৪/৩১৫

[২] তারীখে দিমাশক ৪৮/৩১৬

[৩] আত-তাবাকাতুল কুবরা; ইবনে সা’দ ৩/২৯৩

[৪] দিরাসাতুল নাকদিয়াহ ফীল মারবিয়াতিল ওয়ারিদাহ ফী শাখসিয়াতি উমারাবনিল খান্তাব ওয়া সিয়াসাতিল ইদারিয়াহ; আবুস সালাম বিন মুহসিন ১/১৮৫



ଏକଟି ଗ୍ରଜାର୍ ଶାଦିଙ୍କ ବଳି

ଏହାଜୀ ଶାନ୍ତି ଯାଦିଖି ବଳି

ମାସଉଦ ଅନିମୀ

ଏକଣ ମହାତ୍ମା
ଶାନ୍ତି ସାଲି

আঁশ্বাহ যখন কাউকে ভালবাসেন, তখন জিবরীল  -কে
ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে
ভালবাসবে। তখন জিবরীল  তাকে ভালবাসেন। তিনি
আসমানের অধিবাসীদের ডেকে বলেন, আঁশ্বাহ জাঙ্গা শানুভূ
অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমাও তাকে ভালবাসো।
এবার আসমানের ফেরেশতারা তাকে ভালবাসতে শুরু করে।
অতঃপর আঁশ্বাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীদের অন্তরে ঐ
ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। [১]

আজকের সমাজের বাস্তব চিত্র পুরোই উলটো। আমি-তুমি মানুষকে খুশি করার জন্য, লোক দেখানোর জন্য কর অযথা কাজ করে থাকি। সকলের ভালোবাসা পেতে, সবার মুখে বাহ বাহ শুনতে কত আয়োজন করি। কিন্তু আল্লাহর হৃকুম পালনের ক্ষেত্রে দুনিয়ার মায়া, খ্যাতি, লোভ ত্যাগ করার বিষয়ে আমাদের খুব কার্পণ্য। অথচ আমরা ভুলে যাই দুনিয়ার মানুষকে সন্তুষ্ট করা সহজ নয়। ইমাম শাফেয়ী রাহিমাত্তুল্লাহ বলেন,

মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না, তাই তুমি নিজেকে
সংশোধন করবে এমন বিষয়কে আঁকড়ে ধরো, মানুষের
সন্তুষ্টি তালাশের লক্ষ বর্জন করো।^{১৩}

আমাদের উচিত শত কষ্ট, বাধা, ভয় উপেক্ষা করে আল্লাহর
সম্মতি তালাশে নিজেকে নিয়োজিত করা। আল্লাহ যদি খুশি
থাকেন আমার উপর, তবে দুনিয়ার লোকদের কথায় কি

আসে যায়। কিন্তু আল্লাহ যদি নারাজ হয়ে যান, তাহলে কিন্তু
আমাদের খারাপ সময় শুরু। হাদিসে আছে,

‘আর যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হোন
তখন জিবরীল ﷺ কে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা
করি ভূমিও তাকে ঘৃণা করো। ফলে জিবরীল ﷺ তাকে
ঘৃণা করেন। অতঃপর আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা
করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অমুককে ঘৃণা করেন অতএব
তোমরাও তাকে ঘৃণা করো। ফলে আসমানবাসী তাকে ঘৃণা
করে। অতঃপর জমিনে তার প্রতি ঘৃণা ছড়ানো হয়।’।৩

হয়রত মু'আবিয়া আনন্দ একবার আয়িশা -র কাছে
উপদেশ চাইলেন। আয়িশা বললেন,

‘মানুষকে খুশি করতে গিয়ে তুমি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে না।
কারণ মানুষ তোমাকে আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচাতে পারবে
না। বরং মানুষ অসম্প্রত্য হলেও আল্লাহকে খুশি করো। কারণ,
আল্লাহর শক্তি অসীম। যা মানুষের অনিষ্ট থেকে তোমাকে
বাঁচাতে সক্ষম।’^[8]

[১] সহীহ বুখারী (৬০৪০)

[২] মানাকিবুশ শাফিয়ী; আবুল হাসান আবুররী ১/৯০ (৫৩)

[৩] সহীহ মুসলিম (২৬৩৭)

[৪] এটি হ্যারত আয়েশা থেকে ইমাম শাবী এর মুসাল বর্ণনা, দেখুন: কিতাবুয় যুহদ; ইবনুল মুবারক (২০০), মুসাফাফে ইবনে আবী শাইবা (৩০৬৩৭), আত তারীখুল কাবীর, ইবনে আবী খাইছামা (৩৫৫০)



প্রোডাক্টিভ রমাদান

টিম ঘোলো (তোমাদের লেখা থেকে)

রমাদান ও ঈদ আলাহুর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নিয়ামত, বিশাল প্রাণ্তি। কোনো মুমিন বাস্তু এই সুবর্ণ সুযোগ হারাতে পারে না। সে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকে এই শুভ ক্ষণের জন্য। তাই পুরো রমাদান মাসকেই প্রোডাক্টিভভাবে ব্যয় করলেই আমরা স্বার্থক। চলো দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আমরা আমাদের রমাদানকে প্রোডাক্টিভ করে তুলতে পারি।

কুরআনের পাঠ শুন্দ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা

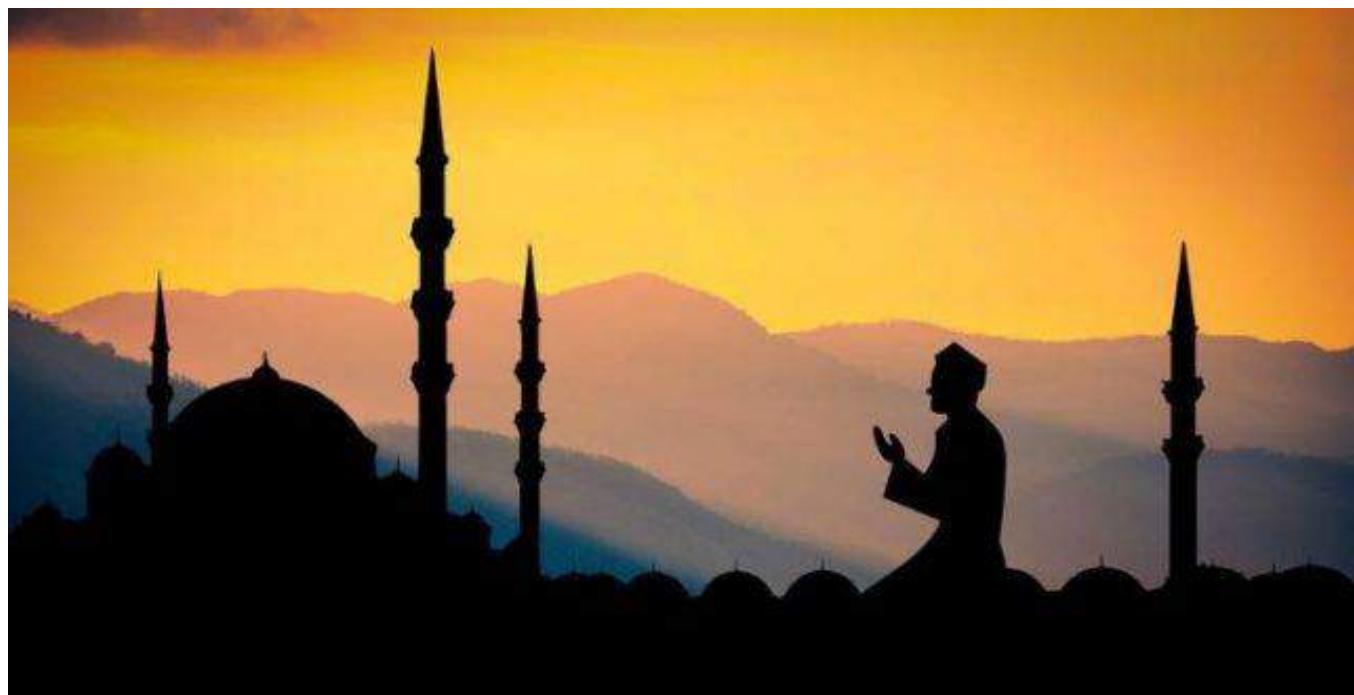
আমার তিলাওয়াত যদি শুন্দ না হয়, তাহলে প্রথম কর্তব্য একটু কষ্ট করে তিলাওয়াত শিখে নেয়া। কারণ নামাজের প্রধান একটি রূক্খ হলো নির্দিষ্ট কিছু অংশের তিলাওয়াত। যদি তিলাওয়াত শুন্দ না হয় তবে নামাজ অপূর্ণস্থ থেকে যাবে। তাছাড়া রাসূল ﷺ তো সবকিছুতেই আমাদের আদর্শ। তিনি যেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন সেভাবে তিলাওয়াতের চেষ্টা করা হবে আমার টার্গেট। সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত শুন্দভাবে পড়তে পারা ঈমানের অনেক বড় একটি শাখা। অনেকসময় আমরা নিজেদের তিলাওয়াতের ব্যাপারে স্যাটিসফারেড থাকি কিন্তু দক্ষ কুরীর সামনে পড়লে মোটা মোটা ভুল ধরা পড়ে। তাই এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া কাম্য।

কুরআন তিলাওয়াত করা ও খ্তম করা

হাদিসে এসেছে, ‘সিয়াম ও কুরআন কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।’^[১] এছাড়াও হ্যরত জিবরীল আলাইহিস সালাম রমাদানের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কুরআন মজিদ শোনাতেন।^[২] এই মাসে পুরো কুরআন বারবার খ্তম করবে। বাসার অন্য সদস্যদের সাথে আমলে প্রতিযোগিতা কাম্য। নেক কাজে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাওয়া খাঁটি মুম্বিনের গুণ।

কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা

পৰিত্র কুরআনে উপস্থাপিত হয়েছে অকাট্য আকীদা-বিশ্বাস, কালজয়ী সব বিধি-বিধান। ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নবী-রাসূলগণের উত্তম আদর্শ আর দুনিয়া ও আধিকারাতের চরম বাস্তবতা। দেখানো হয়েছে কিয়ামত দিবসের ভয়াল দৃশ্যাবলি। এসব নিয়ে রমাদানের দিনরাত্রিতে আমরা গভীর চিন্তা-ভাবনা করব। এ লক্ষ্যে আমরা আস্থাভাজন আলিমগণের দারসে কুরআনে বসতে পারি। কুরআনের এ সকল হিদায়াত ও নির্দেশনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বা তাদাবুরের সবচে সহজ উৎকষ্ট স্ট্যান্ডার্ড পন্থ হলো, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকীদা ও আমলের অনুসারী কোনো ভালো আলিমের পরামর্শক্রিয়ে তার তত্ত্বাবধানে থেকে কোন সংক্ষিপ্ত কিন্তু নির্ভরযোগ্য তরজমা ও তাফসির পড়ার চেষ্টা করা।



কোথাও খটকা লাগলে জিজ্ঞেস করে নেয়া। নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছা। সংক্ষিপ্ত তাফসির যেমন: শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী হাফিয়াহল্লাহর ‘আসান তরজমায়ে কুরআন’ এর বাংলা অনুবাদ যা ‘তাফসিরে তাওয়ীহল কুরআন’ (মাকতাবাতুল আশরাফ) নামে বের হয়েছে। এর সর্বশেষ সংস্করণ আগের তুলনায় অনেক পরিমার্জিত। এছাড়া শাইখুল হিন্দ রহিমাহল্লাহ এবং শাইখুল ইসলাম শাকীর আহমাদ উসমানী রহিমাহল্লাহ-র তরজমার আলোকে প্রস্তুত করা সংক্ষিপ্ত তাফসিরে উসমানীও (থানভী লাইব্রেরী) সুন্দর। হাকীমুল উস্মত হ্যারত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহল্লাহ এর ‘বয়ানুল কুরআন’ (রাহনুমা প্রকাশনী) এর প্রথম খন্দ-ও আলহামদুলিল্লাহ দক্ষ হাতে অনুবাদ হয়ে বাজারে এসেছে। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহিমাহল্লাহ এর অনুদিত ‘মা’আরিফুল কুরআন’ ও চমৎকার পাথেয়।

হাদিসে নববী থেকে শিক্ষা আহরণ

ইমাম নববী রাহিমাহল্লাহ (৬৭৬হি.) এর ‘রিয়াদুস সালিহীন’ এক্ষেত্রে এক অনন্য হাদিস সংকলন। একই মলাটে দীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মিলন ঘটেছে এখানে। বিন্যাসও বৈচিত্র্যপূর্ণ। বইটা মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে হাদিসগুলোর প্রাঞ্জল ও সারগর্ভ ব্যাখ্যা ও টীকাসহ ৪ খন্দে প্রকাশ পেয়েছে।

অধিকহারে নেক আমল করার চেষ্টা করা

এ মাসে বেশি বেশি নেক আমল করা উচিত, বিশেষ করে শেষ দশকে। যখন রমাদানের শেষ দশক আসতো তখন নবীজি **তাঁর কোমর বেঁধে ইবাদতে নামতেন**, এবং রাত জাগতেন এমনকি পরিবার-পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন।^[৩]

তাসবিহ পাঠ ও জিকির

বেশি বেশি জিকির তাসবিহ পাঠ করতে পারো। এখানে কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

রাসুল **বলেছেন**, ‘যে লোক প্রতিদিন একশ’বার ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে তা সমুদ্দের ফেনা পরিমাণ হলেও।^[৪]

তিনি **আরো বলেন**, ‘যে লোক (একবার) বলে ‘সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়াবিহামদিহি’, তার জন্য জাগাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।’^[৫] এছাড়াও তুমি ‘মাছুর দু’আ ও জিকির’: মাওলানা ইউসুফ বিন আব্দুস সালাম (রাহনুমা প্রকাশনী), ‘কিতাবুদ দু’আ’: উম্মে আবুল্লাহ (প্রকাশনা বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া) বইগুলোর সাহায্য নিতে পারো।

তারাবীহ-র সালাত

আল্লাহর রাসুল **বলেন**, ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে নেকির আশায় রমাদানে কিয়ামুল লাইল আদায় করবে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।’^[৬] বিশ রাকআত তারাবীহ কিছুতেই মিস কোরো না

যেন! কুরআনের যে অংশ তোমার মুখস্থ আছে, সেটা দিয়ে রমাদানের রাতে বিশেষ শেষ দশকে বেশি বেশি নফল নামাজ পড়তে পারো।

আম্মুকে একটু স্বন্তি দেওয়া

অনেক সময় দেখা যায় আম্মুরা আমাদের পছন্দমত ইফতার বানাতে দিয়ে নিজেদের আমলের দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। তাই চলো এই রমাদানে আম্মুকে সাহায্য করি, যেন আম্মু তার আমল ঠিক রাখতে পারেন এবং আমরাও পেতে পারি অজস্র দু’আ। আর তাছাড়া, স্বাস্থ্যকে ফিট ও সতেজ রাখতে আমাদের প্রথাগত অতিরিক্ত তৈলাক্ত, ভাজাপোড়া খাবারগুলোও ইফতারের তালিকা থেকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করব।

ডেইলি সাদাকা

কমপক্ষে প্রতিদিন অতত দুই টাকা করে হলেও দান করার চেষ্টা রাখা। প্রিয় নবীজি তাঁর সমাজের সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। রমাদান এলে নবীজির দানের পরিমাণ অনেকগুণে বেড়ে যেত।^[৭]

প্রোডাক্টিভ হোক আমাদের সবার রমাদান। আমিন।

তথ্যসূত্রঃ-

- [১] আল-মু’জামুল কাবীর: তাবরানী (১৪৬৭২), আরো দেখুন: মাজমাউয যাওয়াইদ; হাইচামী (৫০৮১), (৩৩১০)
- [২] সহীহ বুখারী (১১০২), সহীহ মুসলিম (২৩০৮)
- [৩] সহীহ বুখারী (২০২৪)
- [৪] সহীহ বুখারী (৬৪০৫)
- [৫] সুনানে তিরমিয়ী (৩৪৬৪), সহীহ ইবনে হিবান (৮২৬), আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন; হাকিম (১৮৪৭)
- [৬] সহীহ বুখারী (৩৭)
- [৮] সহীহ বুখারী (৬)

তাঁর কালামের মায়ায়

- রিয়াদ হাসান

যখনি আত্মবিশ্বাস ভুলে যাই
হতাশার অরণ্যে নিজেকে হারাই,
পড়ে যাই যদি বিফলের ছায়াতলে।

বিস্মিত হয়ে শুনি তখনি,
মায়াভূত তাঁর কালামের ধ্বনি।
স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসা দিয়ে যিনি
আরশ থেকে কথা বলে-
অবশ্যই বিশ্বাসীরা সফল হয়েছে।[১]

কষ্টের উঠাল-পাথাল চেউয়ে
দুঃখের তুফানে কভু ধৈর্যের পাল ছিড়ে,
ক্লান্তির সাগরে যদি যাই ডুবে।

এত এত সব বিষাদের ক্ষণে!
দরদ মাখা তাঁর কালাম শুনে,
ক্লেশ-ক্লান্তি নিমিষেই যায় উবে।
নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বন্তি।[২]

তাঁর কালামের মায়ায়
আমি মুজাহাদা করে এক পা বাড়ালেই,
খুলে যায় 'ইলমের' দোর।

তাঁর কালামের মায়ায়
আমি বাতিলের ঘন আধার কাটিয়ে,
পাই 'সীমানা' আলোর ভোর।

তাঁর কালামে মায়ায়
আমি মুঞ্ছ হয়ে সীমাহীন তার করণ্যায় বানভাসি,
তাই তো আমার রব এবং তাঁর কালামকে ভালোবাসি।

তথ্যসূত্রঃ

[১] সূরা মূ’মিনুন (আয়াত ১)

[২] সূরা আলাম নাশরাহ (আয়াত ৬)



কথার লাগাম টানো

যাবীন তাসনিম প্রলাহী



শেঁজারে অনেক্ষণ ধরে গল্প করছে নিশি তার বান্ধবী তানিমার সাথে। প্রথমে পড়াশুনা নিয়ে শুরু হলেও আস্তে আস্তে গল্পের মোড় ঘুরে যায় অন্যদিকে। কোন শিক্ষক কেমন, কার সাথে কী হয়েছে, নিজেদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হতে থাকে, বলা যায় শুধুই গল্প। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নেই। কেবল মজার জন্যই বলা। এক পর্যায়ে মজার ছলে তানিমা বিয়ে প্রসঙ্গও নিয়ে আসে। নতুন যৌবনের প্রারম্ভে এর চেয়ে রসালো আর কী হতে পারে? এক পর্যায়ে বিভিন্ন কথার ভিড়ে নিশি তানিমার কথায় সায় না দিলে ওপাশ থেকে তানিমা লেখে, ‘তুই কথা ঘুরাস’।

তানিমার কাছে এটা মজা হলেও নিশি কি অপমানিত হয় না?

দুই প্রতিরেশি আন্টি শুরু করে বিভিন্নমুখী গল্প। তাদের রান্না থেকে ধরে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা, ভবিষ্যৎ, গল্প যোগ দেয় বাসার অন্যরাও। মেয়েরা-মায়েরা মিলে শুরু করে মজার সব গল্প। তারা ভুলে যায় গীবতের ছলে তারা স্বজাতির মাংস খাচ্ছে। অথচ তারা বাস্তবে রান্না ছাড়া থেতে পারে না। আঞ্চাহ তা'আলা বলেন,

‘তোমরা একে অপরের গিবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাকো।’^[১]



রাফিনের পড়ার ফাঁকে বন্ধুরা মিলে আড়ায় বসে। আড়া জমে তখনই যখন তাতে কোনো না কোন নায়িকা কিংবা সংগীতশিল্পী বা কোনো মেয়ের গল্প থাকে। অল্পকিছু গল্পেই যে সেটা সীমাবদ্ধ থাকে তা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে সঠিক নয়! আড়াগুলো খুব দ্রুতে শালীনতা হারিয়ে ফেলে। অশ্লীল কথাবার্তার চেত ভাসিয়ে নিয়ে যায় নোংরা নগরীতে। আমাদের জীবনে একটা বড় অংশ অতিবাহিত করি কেবল

অপ্রয়োজনীয় কথায়। যে কথার কোনো মূল্য নেই, কোনো লাভ নেই, নেই কোনো উপকার। কেবলই বিনোদনের জন্য। এই বিনোদন কতটুকু ঠিক?

অনর্থক আলাপ বিভিন্নমুখী পাপের জন্ম দেয়। অপ্রয়োজনীয় আলোচনা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ভুলিয়ে দেয় যে আমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করব। আমাদের এমন সব বিষয়ে মগ্ন করে রাখে, যা আদতে সত্যিকার কোনো কাজে দেয় না। আমরা ভুলে যাই আমাদের ফিরতে হবে। খেয়াল করিনা এই বাজে খোশগল্লের মাঝখানে যদি আমার ঘৃত্য এসে যায়? মালাকুল ঘটত এসে হঠাত যদি বলে উঠে তোমার সময় শেষ? কথা থেকে একসময় অপরাধ জগতের প্রেরণা জন্মে যায়। আমাদের ভাব দেখে মনে হয় জীবন যেন শুধু চিল করার নাম। উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের পথে নিয়ে যায় যে গল্প, তা কী করে মুমিন চরিত্রের অংশ হতে পারে?

‘নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ-যারা তাদের সালাতে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে।’^[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন স্বল্পভাষী। তাঁর সবকিছু আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। যেমন একদা তিনি হ্যারত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহ-র সাথে সাক্ষাৎ হলে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন দুটি গুণ সম্পর্কে আবহিত করব না, যেগুলো অন্যান্য গুণ তুলনায় পিঠে হালকা কিন্তু মিজানে ভারী? তিনি বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি উন্নত চরিত্র ও দীর্ঘ সময় চুপ থাকা; এদুটি গুণ আঁকড়ে ধরো।^[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনর্থক কথা মোটেও পছন্দ করতেন না। নবীজি ﷺ বলেন, ‘নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হতে আমার নিকট সবচেয়ে অপচন্দনীয় ব্যক্তি ও কিয়ামত দিবসে আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী ব্যক্তি হলো ঐ সকল লোক যারা বাচাল, আড়ম্বরতা নিয়ে প্রলাপকারী ও অহংকারী।’^[৩]



“**কোনো ব্যক্তির ইসলাম পালনের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করা।**”

আমাদের সৌন্দর্যও প্রকাশিত

হয় তখন, যখন আমরা আজেবাজে কথা হতে দূরে থাকি। হাদিসে আছে, ‘কোনো ব্যক্তির ইসলাম পালনের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করা।’^[৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা বলতেন কম, শুনতেন বেশি। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তার প্রতিটি শব্দ হতো ভারী, সাবলীল ও সহজ। অপ্রয়োজনীয় কাজ আর কথায় সময় নষ্ট করতেন না মোটেও। আমাদের জীবন খুব সংক্ষিপ্ত; এতই সংক্ষিপ্ত যে আমরা ভাবতেও পারিনা। আমরা ভাবি আমার সময় আছে, অথচ আমরা যদি জনতাম যে কিয়ামতে হেরে যাওয়া মানুষগুলো কেবল এক মুহূর্তের জন্য আসতে চাইবে আর আল্লাহর জন্য সময় দিতে চাইবে। আমাদের হাতে অফুরান সময়; এই সময় কে কাজে লাগানোর মতো সুযোগ হয়ত নাও পেতে পারি। আমরা তা ব্যয় করে ফেলি অথবা আলাপে। একটু সবার সাথে সোশ্যাল হওয়ার জন্য, একটু মজা করার জন্য। মজা আর রসিকতা জীবনের অংশ। তবে সেই রসিকতা হতে হবে সুন্নাহর পদ্ধতি। অনর্থক কথা আর কাজে নয়। আসছে সংযমের মাস। সংযমের মাসে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি আমাদের স্বাভাবিক কিছু কার্যক্রম। সংযম আমরা এইবার কথাতেও করব ইনশাআল্লাহ।

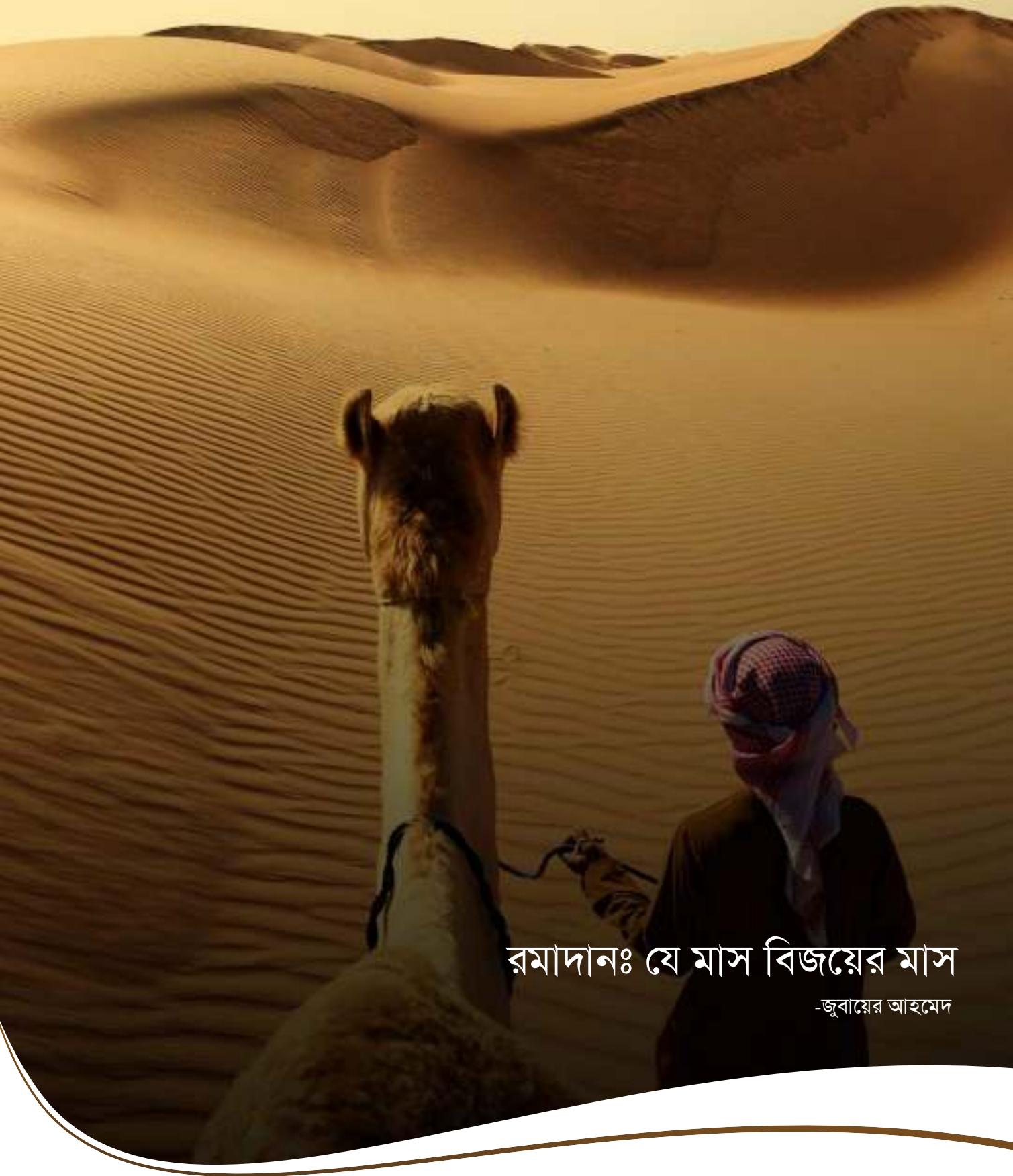
[১] সুরা হজুরাত (১২)

[২] সুরা মুমিনুন (১-৩)

[৩] মুসনাদুল বায়ার (৭০০১), মুসনাদু আবী ইয়া'লা (৩২৯৮)। বর্ণনাটি দুর্বল, দেখুন: বায়ানুল ওয়াহামি ওয়াল দৈহাম; ইবনুল কাতান ফাসী ৪/৬৩৯, মুখতাসারু যাওয়ায়িদি মুসনাদিল বায়ার; ইবনে হাজার আসকালানী ২/১০২৭, মাজমাউয যাওয়াইদ; হাইছামী ১০/৩০১।

[৪] মুসাম্মাফে ইবনে আবী শাহিদা (২৫৩২০), আল আদাবুল মুফরাদ; বুখারী (১৩০৮), জামে তিরমিয়ী (২০১৮), সহীহ ইবনে হিব্রান (৪৮২), মুসনাদে আহমাদ (৮৮২২)

[৫] মুয়াব্বা মালিক (২৩৫২), জামে তিরমিয়ী (২০১৮), সহীহ ইবনে হিব্রান (২২৯), মুসনাদে আহমাদ (১৭৩২), সুনানু ইবনি মাজাহ (৩৯৭৬)



রমাদানঃ যে মাস বিজয়ের মাস

-জুবায়ের আহমেদ

আমরা সবাই জানি যে, রমাদান মাস ইবাদাতের মাস, রমাদান মাস রহমতের মাস, রমাদান মাস মাগফিরাতের মাস, রমাদান মাস নাজাতের মাস। কিন্তু আমরা কি জানি যে, এসবের পাশাপাশি রমাদান মাসকে আমরা আরো একটা পরিচয় আছে? রমাদান বিজয়ের মাস, হাঁ বিজয়ের মাস। আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই রমাদান মাসে অনেক যুদ্ধে বিজয় দিয়ে সন্মানিত করেছেন। আসো তবে জেনে নেয়া যাক অল্প কিছু বিজয় সম্বন্ধে যেগুলো আল্লাহ তায়ালা আমাদের রমাদান মাসে দান করেছেন:

বদর যুদ্ধে বিজয়: বদর যুদ্ধ মুসলমান ও কাফের মুশরিকদের মধ্যকার প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধটি সংঘটিত হয় পবিত্র রমাদান মাসে।^(১) ইসলামের প্রথম এই যুদ্ধে মুসলিমরা জয়লাভ করে এবং কাফের মুশরিকরা পরাজিত হয়।

মক্কা বিজয়: আমরা যদি বলি যে মক্কা বিজয় হচ্ছে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজয়, তাহলে কথাটা ভুল হবে না। এই মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরী ৮ম সনের রমাদান মাসে।^(২)

এখন আমরা জানবো রাসুল ﷺ-এর মৃত্যু পরবর্তী যুগের কিছু বিজয়ের ইতিহাস। যেগুলোও রমাদান মাসেই আল্লাহ তায়ালা আমাদের দান করেছিলেন।

স্পেন বিজয়: রাসুল ﷺ-এর মৃত্যু পরবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিজয় হচ্ছে ‘আন্দালুস বিজয়’। যে বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানরা সুদীর্ঘ ৮০০ বছর আন্দালুস (স্পেন) শাসন করে। এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে তৎকালীন স্পেনের খৃষ্টান রাজা রডারিকের সৈন্য দলের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় হিজরী ৯২ সনের রমাদান মাসে।^(৩) যেখানে মুসলিমরা জয়লাভ করে এবং খৃষ্টানরা পরাজিত হয়।

‘মক্কা বিজয় হচ্ছে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজয়’

আমুরিয়াহ এর যুদ্ধ: আমুরিয়াহ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিখ্যাত শহরগুলোর একটি, হিজরী ২২৩ এর রমাদানে। বিজয় হয়েছিল খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ এর মাধ্যমে, যখন রোমান রাজা মুসলিমদের ভূমিতে আগ্রাসন চালায় এবং মুসলিম বন্দীদের নাক, কান কর্তন এবং তাদেরকে অঙ্গ করে দেয় এবং অনেক মুসলিম মা-বোনদের উঠিয়ে নিয়ে যায়, মু'তাসিম তাদের ভূমিতে আক্রমণ চালান এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাদেরকে পরাজিত করেন।^[৪]

হারিম এর যুদ্ধ: হিজরী ৫৫৯ বছর এর রমাদানে। নুরুন্দিন মাহমুদ যিংকির নেতৃত্বে মুসলমানরা ফ্রাসকে পরাজিত করে এবং হারেম অঞ্চলকে স্বাধীন করে যা বর্তমান সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের এর গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত।^[৫]

আইন জালুতের বিজয়: আইন জালুতের যুদ্ধ মুসলিম উস্মাহর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল তৎকালীন সুপারপাওয়ার তাতারীদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধটি এমন সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন তাতারীদের অভিধানে পরাজয় বলতে কোন শব্দ ছিলনা, তারা ছিলেন অপরাজেয়। আর মুসলিম উস্মাহর অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। ঠিক সেই সময় মিশরের শাসক সাইফুন্দিন কুতুজ এর নেতৃত্বে তাতারীদের সাথে সংঘটিত হয় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যেখানে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র ২০ হাজার, অপরদিকে তাতার সৈন্য সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিমরা জয়লাভ করে এবং আপরাজেয় তাতাররা পায় পরাজয়ের স্বাদ। আর এই আইন জালুতের যুদ্ধও সংঘটিত হয় হিজরী ৬৫৮ সনের রমাদান মাসে।^(৬)

শাকহাব এর যুদ্ধ: হিজরী ৭০২ এর রমাদানে সুলতান নাসির ইবন মুহাম্মাদ এবং শাহখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ এর প্রত্যক্ষ্য নেতৃত্বে মুসলমানরা তাতারদের পরাজিত করে দামেক এর নিকটস্থ শাকহাব অঞ্চলে।^[৭]

তথ্যসূত্রঃ

১/ সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৬২৬

২/ সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩৮৯

৩/ আল বায়ানুল মুগ্রির ফী আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব; আবু আব্দিল্লাহ মারাকেশী ২/৫,

আল-কামিল ফিত-তারীখ; ইয়মুন্দিন ইবনুল আচীর ৪/৩৯, আল-ইহাতাহ ফী আখবারি গারনাতাহ; লিসানুন্দিন ইবনুল খাতীব ১/১৯

৪/ আল-মা'আরিফ; ইবনে কুতাইবা পৃ ৩৮৯, আত-তামবীহ ওয়াল ইশ্রাফ; আবুল হাসান মাসউদী পৃ ৩০৬, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/৩১৮

৫/ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১২/২৪৮, আন-নাওয়াদিসন্দুল সুলতানিয়াহ ওয়াল-মাহাসিন্দুল ইউসুফিয়াহ; বাহাউদ্দিন ইবনে শান্দাদ (৫৫৯ হিজরীর বিবরণ),

আর-রাওদাতাইন ফী আখবারিদ দাওলাতাইন আন-নুরিয়াহ ওয়াস-সালাহিয়াহ; আবু শামা মাকদিনবী ১/৩২৮

মহিমান্বিত রজনী



খুশবু খুশি মীম



রমাদানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে অজস্র নেকী লাভের সুযোগ দিয়েছেন পাশাপাশি বান্দারা যেন তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করতে পারে এবং নিজেদের অতীতের সমস্ত গুনাহের জন্য মাফ চেয়ে নিতে পারে সেই সুযোগও করে দিয়েছেন।

তারমধ্যে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত এবং ফিলতপূর্ণ সুযোগটি আসে "লাইলাতুল কুদর" এর রাতে। এ রাত অন্যসব রাতের মত নয়; এটা সেই রাত যে রাতে পবিত্রগত্ব "আল-কুরআন" লওহে মাহফুয় থেকে নাযিল হয়েছিল।

মুমিন মুসলিমদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ রাত সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে এবং কুরআনে পুরো একটি সূরাই রয়েছে লাইলাতুল কুদর সম্পর্কে; যার নাম 'সূরা কুদর' এবং সূরা দুখানেও লাইলাতুল কুদর সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ মহিমান্বিত রজনীর গুরুত্ব জানতে ও অনুধাবন করতে হলে এই আয়তগুলোর দিকেই আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত।

সূরা কুদর :

•সূরা কুদরের ১ম আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-
"নিশ্চয়ই আমি এটি(কুরআন) নাযিল করেছি কুদরের
রাতে।"

ইবন আবুস রায়. প্রমুখ সাহাবী হতে বর্ণিত যে, লাইলাতুল কুদরে সমগ্র কুরআন লাওহে মাহফুজ হতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর প্রয়োজনে দীর্ঘ ২৩ বছরে ধীরে ধীরে রাসূল ﷺ-এর উপর নাযিল হয়েছে। [১]

•আয়াত ২: "আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কি জানো?"

•আয়াত ৩: "কুদরের রাত এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।"

হাজার মাস অর্থাৎ ৮৩ বছরেরও বেশি সময়। তাই এই রাতে করা বান্দার ইবাদত ও নেক আমল এক হাজার মাসের ইবাদতের তুলনায় উত্তম সুবহানআল্লাহ।

আর চিন্তার বিষয় হল; যে ব্যক্তি এই বিশেষ রাতটি হেলাফেলায় নস্ট করে, সে কি নিজেই নিজের উপর জুলুম করছে না? নিজেই এত বড় সুযোগ হাতছাড়া করে দিচ্ছে!

•আয়াত ৪: "সেই রাতে ফেরেশতাগণ এবং জীবরীল প্রত্যেক কল্যাণময় বস্ত নিয়ে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অবতরণ করেন।"

এখানে কিছু বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করি।

আমরা জানি 'লাইলাহ' অর্থ রাত্রি। আর, 'কুদর' শব্দের অর্থ মূল্য, মাহাত্ম্য, সম্মান। আবার অন্যদিকে 'কুদর' অর্থ ভাগ্য, তাকদীর। এ রাতে আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে থাকে তাই এর নাম লাইলাতুল কুদর।

এ লাইনটি পড়ে অনেকেই হয়ত বলতে পারে আসমান ও জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। [২] এখন বলছেন কুদরের রাতে!

আসলে বিষয়টি হল এইয়ে; হ্যাঁ এটা সত্যি আসমান ও জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে আর কুদরের রাতে পরবর্তী কুদর রাত পর্যন্ত এক বছরের সবকিছু ফেরেশতাদের হাতে

তুলে দেয়া হয় এবং তারা সেগুলো নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসেন।

যেখানে বান্দার বিভিন্ন বিষয়ের ফয়সালা থাকে এবং এক বছরের হায়াত, মৃত্যু, রিজিক সহ সকল হিসাব নির্ধারিত থাকে।

এ বিষয়ে আল্লাহ আরো বলেন,

"এটি হলো সেই রাত, যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ে প্রজাজনোচিত ফয়সালা দেয়া হয়ে থাকে"

"এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্বরূপ, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [৩]

আলোচ্য সূরা কুদরের চার নাম্বার আয়াতে 'ফেরেশতাগণ' বলার পরে প্রথকভাবে 'রহ' বলে ফেরেশতাগণের সর্দার হিসাবে জিবরাইল আলাইহিস সালাম-এর স্বতন্ত্র মর্যাদা নির্দেশ করা হয়েছে। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাদের নবী হ্যারত মুহাম্মদ এর মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিক্রম শুধু কুদরের রাতে; এই বিশেষ রাতে তিনি আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতাদের নেতৃত্ব দিতে দিতে পৃথিবীতে নেমে আসেন।

সুবহানআল্লাহ

হাদিসে এসেছে, এ রাতে পৃথিবীতে ফেরেশতারা এত বেশি অবতরণ করেন যে, তাদের সংখ্যা পৃথিবীর প্রস্তরখন্ডের চেয়েও বেশি। [৪]

আয়াত ৫: "এ রাতে কেবল শান্তি-শান্তি। যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।"

এ রাতে কেবলই শান্তি। ফেরেশতারা মানুষদের সালাম জানাতে থাকেন ফজর পর্যন্ত। এ রাতে শয়তান কোন অনিষ্ট করতে পারে না, কাউকে কস্ট দিতে পারে না। [৫]

আল্লাহ তা'আলা রমাদানে কুদরের রাত আছে বললেও এটি কোন রাত সেটি পরিষ্কার করে বলে দেননি, হ্যাত আমাদের ভালোর জন্যই বলেননি।

কুদরের রাতে আমাদের করণীয়:

এ রাতে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির জন্য, নেক হায়াত, উত্তম রিজিক, কিংবা সহজ মৃত্যু-সহ সবকিছুর জন্য আল্লাহর দরবারে চাইতে হবে। নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির করতে হবে। কারণ ভাগ্য আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত, তবে বান্দার অনুনয় বিনয়ে বিগলিত হয়ে ভাগ্য পরিবর্তনও তাঁর-ই ইচ্ছাধীন। [৬] তাই এই রাতে না ঘূর্মিয়ে, সময় কে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর কাছে হাত তুলতে হবে। আর আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার হাত খাল ফিরিয়ে দেন না, এতে তিনি লজিত বোধ করেন। [৭]

একটি দু'আ:

শবে কুদরে কোন দু'আটি বেশি বেশি পড়বে? হাদিসে এসেছে-

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি

বলেন, একবার আমি রাসুলুল্লাহকে জিজেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি বলে দিন, আমি যদি লাইলাতুল কুদর কোন রাতে হবে তা জানতে পারি, তবে আমি কৌ (দু'আ) পড়বো?

রাসুলুল্লাহ বললেন, তুমি বলবে-

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُورٌ تُحِبُّ الْعَفْرَ فَاعْفُ عَنِّي

উচ্চারণ : আল্লাহল্লাহ ইমাকা আফুটযুন; তুহিমুল আফওয়া; ফাফু আন্নি। [৮]

(অর্থ, হে আল্লাহ! তুমি তো ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে পছন্দ করো, তুমি আমাকেও ক্ষমা করে দাও।)

প্রচলিত একটি জাল হাদিস:

"যারা শবে কুদরে ইবাদতের নিয়তে সন্ধ্যায় গোসল করবে তাদের পা ধোত করা শেষ না হতেই পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়" -বানোয়াট কথা! [৯]

আমাদের সর্তক থাকতে হবে রমাদানে শেষ দশ রাত, যদি তাও না পারি শেষ পাঁচ বিজোড় রাত যেন হেলা ফেলায় ঘূর্মিয়ে শেষ না হয়ে যায়। হতে পারে এই রাতে অর্জিত বিপুল নেকীই আখিরাতে আমাদের সাফল্য এনে দেবে। আমলনামা ডান হাতে এনে দিবে। এ রাতে অর্জিত নেকীর কল্যাণেই হ্যাত আমরা আল্লাহর কাছ থেকে শুনতে পাবো সেই কাঙ্গিত কথাটি: "প্রবেশ করো আমার সৃজিত জান্মাতে"! [১০]



তথ্যসূত্র:

[১] ফাযায়িলুল কুরআন; আবু উবাইদ পৃ ৩৬৭, ফাযায়িলুল কুরআন; ইবনুদ দুরাইস (১১৮), তাফসীরে তাবারী ৩/৪৪৫, আরো দেখুন: ফাযায়িলুল কুরআন; ইবনে কাসীর পৃ ৩৬, ফাতহুল বারী; ইবনে হাজার ৯/৮

[২] সহীহ মুসলিম (৬৮৪২)

[৩]সূরা দুখান (আয়াত: ৬)

[৪] মুসনাদে আহমাদ (১০৭৩৪), সহীহ ইবনে খুয়াইমা (২১৯৪)

[৫] তাফসীরে ইবনে কাসীর ৮/৪৪৪

[৬] সুনানে তিরমিয়ী (২১৩৯), সহীহ ইবনে হিব্রান (৮৭২), মুসনাদে আহমাদ (২২৪১৩)।

[৭] সুনানে তিরমিয়ী (৩৫৫৬), সুনান আবী দাউদ (১৪৮৮), সহীহ ইবনে হিব্রান (৮৭৬)

[৮] সুনানে তিরমিয়ী (৩৫১৩), আল-মুসতাদরাক আলাস-সাহীহাইন (১৯৪২), মুসনাদে আহমাদ (২৫৩৮৪)

[৯] প্রচলিত জাল হাদিস পৃষ্ঠা ১০৬; হাদিসের নামে জালিয়াতি পৃষ্ঠা ৫৫৪

[১০]সূরা ফাজর (আয়াত-৩০)

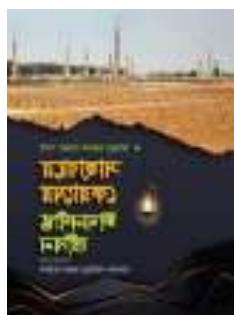
বই- রাজকুমারীৰ আৰ্তনাদ



মূল নাম- বেগমাত কে আসু
লেখক- খাজা হাসান নিজামি
অনুবাদক- ইমরান রাইহান
প্রকাশনা- নাশত পাবলিকেশন
প্রকাশকাল- জুলাই ২০১৯
পৃষ্ঠাসংখ্যা- ১৯২
মুদ্রিত মূল্য- ৩৪০

১৫২৭ সালে সম্রাট বাবুৰ যখন দিল্লীৰ সিংহাসনে আৱোহণ কৰেন, তখন থেকে ভাৰতবৰ্ষে শুৱ হয় মোঘল পৱিত্ৰে শাসন; যা একাধাৰে চলতে থাকে ৩১৩ বছৰ। ১৮৫৭ সালে সিপাহী-জনতাৰ সশস্ত্ৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম শুৱ হয়। কয়েকমাসে ইংৰেজ সৱকাৰ তাৰ দালালদেৱ মাধ্যমে আন্দোলনকে দমন কৰে ফেলতে সক্ষম হয়। বিদ্ৰোহেৱ অপৰাধে ১৮৫৮ সালে দিল্লীৰ শেষ সম্রাট বাহাদুৰ শাহ জাফৱকে প্ৰহসনমূলক বিচাৰে রেঙুনে নিৰ্বাসিত কৰা হয় আৱ ধৃত শাহজাদাদেৱ নিৰ্মতভাৱে হতা কৰা হয়। এতটুকু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমৱাৰা সাধাৱণ ইতিহাস-পাঠক প্ৰায় সবাই জানি। কিন্তু মোঘল পৱিত্ৰে অবশিষ্ট সদস্যদেৱ পৱিণতি কী হয়েছিল? এটা আমৱাৰা খুব কম মানুষই জানি। তাৰে কৱণ পৱিণতিৰ দাস্তান ছোট ছোট গল্পাকাৰে অত্ৰ বইতে তুলে ধৰেছেন ঐতিহাসিক খাজা হাসান নিজামি। আৱ বাংলায় তাৰ স্বার্থক ভাষান্তৰ কৰেছেন তৱণ আলিম ও লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখক ও অনুবাদক ইমরান রাইহান। বইটিৰ গল্পগুলো খুব চিত্তাকৰ্ষক ও ঝাৰবাৰে। অন্যান্য গৎবাঁধা ইতিহাসেৱ বইগুলোৰ মত একথেয়ে ও বিৱৰিতি উদ্বেককাৰী নয়। শিরোনামগুলো চমকপ্ৰদ; সূচি পড়লেই মনে চায় ভেতৱে কী লেখা একটু পড়ে দেখি। যেমন- ‘দিল্লীবাজাৰে ভিখাৰি শাহজাদা’, ‘শাহজাদা যখন ঝাড়ুদাৰ’, ‘রাজকুমারীৰ আৰ্তনাদ’, ‘সাকিৰ হাতে পানপাত্ৰ ও ভিক্ষুক’ ইত্যাদি। কয়েকটি রোমহৰ্ষক কাহিনী তোমাকে ব্যাখ্যিত ও বিষণ্ণ কৰে তুলবে। ইতিহাসেৱ পাঠশালায় তোমাকে স্বাগতম।

বই: সাহাৰায়ে কেৱামেৰ জীবনে কুৱানানুল কাৰীম কিছু দিক কিছু দৃষ্টান্ত

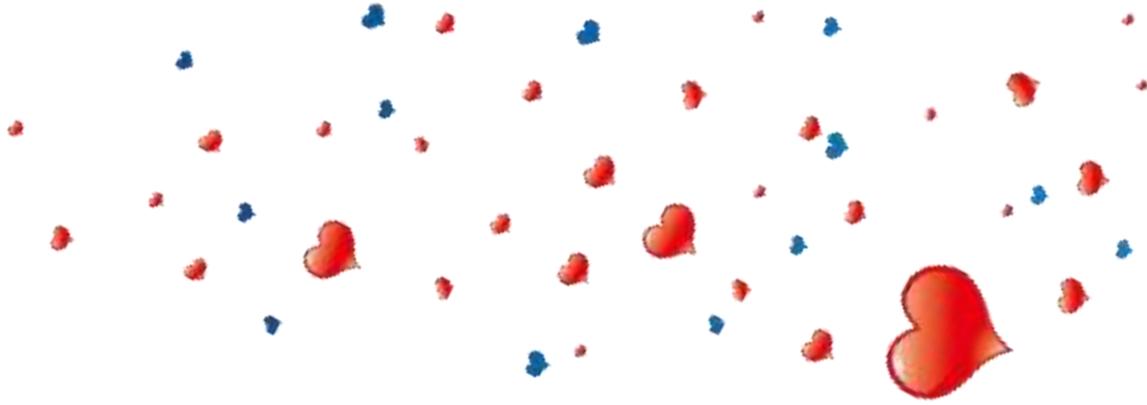


লেখক: মাওলানা সাঈদ আহমাদ বিন গিয়াসুল্লীন
প্রকাশক: প্রকাশনা বিভাগ, মারকায়ুদ দাওয়াহ আল
ইসলামিয়া ঢাকা
পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৯৩

দৱজায় কড়া নাড়ছে রমাদান, কুৱানানেৰ মাস। আমৱাৰা ব্যস্ত থাকব কুৱান নিয়ে। মন ভৱে পাক কালাম তিলাওয়াত কৰব। কুৱানেৰ হিদায়াত ও নিৰ্দেশনাগুলো নিয়ে চিন্তা কৰব। চলতি জীবনেৰ সাথে মিলিয়ে দেখব। কতটা কুৱানেৰ কাছাকাছি আসতে পেৱেছি আৱ কতটা পথ এখনো পাড়ি দেয়া বাকি। তবে এই তিলাওয়াত-চিন্তা আৱ মিলিয়ে দেখোৱ কাজটা যদি সূচারূভাৱে কৰতে চাই, আমাদেৱকে সাহাবিদেৱ জীবনেৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰা উচিত। তাঁৱে ছিলেন প্ৰথম কাফেলা; কুৱান যাদেৱকে সৱাসিৰ সম্বৰ্ধন কৰেছে। তাঁদেৱ সম্পর্ক কুৱানেৰ সাথে কেমন ছিল? নামাজে-তিলাওয়াতে-কাজেকৰ্মে-চিন্তাচেতনায়-মনমগজে? এ বিষয়ে মাওলানা সাঈদ সাহেবেৰ লেখা বইটা আমাদেৱ জন্য অসামান্য এক পাথেয়। ‘কুৱানেৰ সাথে সম্পৰ্ক গড়ে তোলাৰ ফলপ্ৰসূ পদ্ধতি’, ‘নিঃত রাতে নামাজে কুৱান তেলাওয়াত’, ‘কুৱান খতমেৰ ক্ষেত্ৰে সাহাবিৱা যেসব বিষয়েৰ প্ৰতি লক্ষ্য রাখতেন’, ‘কুৱান পড়ে শিহারিত-আলোড়িত হওয়া’, ‘কুৱানেৰ আনুগত্য ও অনুসৱণেৰ অতুলনীয় দৃষ্টান্ত’, ‘কুৱান সম্পৰ্কে সাহাবিদেৱ কিছু বাণী, কিছু অনুভব-অনুভূতি’— এমন চমৎকাৰ সব শিরোনামে সাজানো বইটি। সামগ্ৰিকভাৱে সাহাবিদেৱ জীবনেৰ সবচেয়ে উজ্জ্বল এই দিকটি সুনিপুণভাৱে তুলে ধৰা হয়েছে এখানে। খুশিৰ কথা হলো, লেখক প্ৰতিটি আলোচনায় পূৰ্বসূৰীদেৱ গ্ৰন্থাবলি ঘেঁটে মৌলিক তথ্যসূত্ৰ নিয়ে হাজিৰ হয়েছেন। ফলে কলেবৱে ছোট হলেও বইটি আলোচ্য বিষয়েৰ একটি প্ৰামাণিক উপস্থাপন কৰতে সক্ষম হয়েছে। রমাদানে আমাদেৱ অনুভব-অনুভূতি হয়ে উঠুক কুৱানময়। মন-মানসে ছেয়ে যাক কুৱানেৰ হিদায়াতে। এ আশা নিয়ে বইটা পড়াৰ আহ্বান।

অল্প সময়ে অধিক প্রিয় হবার উপায়

- মো সৈকত খন্দকার



কোন ব্যক্তি যদি অতিসংক্ষিপ্ত সময়ে আল্পাহর নিকটতম হতে চায় তার জন্য অন্যতম কোর্স হলো-'সিয়াম' তথা রমাদানের রোজা। রমাদান আল্পাহর নৈকট্য ও গুনাহ মাফের অন্যতম একটি মাস। সঠিকভাবে যদি রমাদানের রোজাসমূহ রাখা হয় এবং তার হকসমূহ আদায় করা হয়, তাহলে সে অবশ্যই আল্পাহর প্রিয়জনদের একজন হয়ে যাবে। বলা যায় রমাদানের এক একটি রোজা মুত্তাকী হওয়ার জন্য এক একটি পাওয়ারফুল ট্যাবলেটের মতো। সিয়ামের মাধ্যমে মানুষ জৈবিক তাড়না থেকে মুক্ত হয়ে উর্ধ্বজগৎ তথা নিজের রবের সাথে এক শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ হতে সক্ষম হয়। রাসুলুল্লাহ "ইরশাদ করেছেন," যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমাদানের রোজা পালন করবে, আল্পাহ পাক তার জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"^[১] সুবহানাল্লাহ!

আল্পাহ কত মহান! আজ যদি কোন শো-রূম থেকে মূল্য ছাড়ের অফার দেওয়া হয় আমাদের মধ্যে কতই না আগ্রহ থাকে। অথচ আল্পাহ আমাদের এর থেকেও কত উৎকৃষ্ট অফার দিচ্ছেন আমাদের কোনো পাত্তাই নেই। কী সেই অফার! এটা হলো গুনাহ মাফের অফার, নিজের নেক আমলকে বৃদ্ধি করার অফার, আল্পাহর নৈকট্য অর্জনের এক সুবর্ণ সুযোগ! তবুও আফসোস কিছু মানুষ সিয়াম পালন করেন না। বিশেষ করে গ্রামের দিকে এর প্রবণতা আরো বেশি। যে কাজের লাভ যত বেশি ক্ষতিও তত বেশি। বালেগ, প্রাণ বয়স্ক প্রত্যেক নর-নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ। আর ফরজ ত্যাগ কত বড় গুনাহর কাজ তা তো প্রায় সকল মুসলিম জানে।

রমাদান মাস নিজেকে চার্জ করার মাস, ঈমানি শক্তিকে আরো দ্বিগুণ রূপে বলিয়ান করার মাস। একটি ফোন চার্জ দিলে সে যেমন ১০-১২ ঘণ্টা অনায়াসেই সার্ভিস দিতে পারে। তেমনিভাবে কেউ যদি রমাদানে পুরোপুরি হক আদায় করে যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, গান-বাজনা হতে দূরে থাকা, নজরের হেফাজত করা, অশ্লীল কথাবার্তা হতে বিরত থাকা এবং সকল প্রকার হারাম ত্যাগ করতে পারে, তাহলে এই আমলগুলো অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। রমাদান মাসের এই ঈমানী চার্জ দিয়ে বাকি মাস সার্ভিস দেওয়া সহজ হয়। কিন্তু রমাজানের পর আমরা আবার ছমছাড়া হয়ে যাই, আবার সেই আগের জীবনে পদার্পণ করি, নামাজগুলো আবারো ছুটতে শুরু করে। কারণ আমরা রমাদানের হকসমূহ সঠিকভাবে আদায় করতে পারিনি, রবের থেকে গুনাহ মাফ করাতে পারিনি।

এই রমাদান মাস নিজেকে পরিবর্তনের মাস, আল্পাহর নৈকট্য লাভের মাস। হয়তো পরের রমাদান মাসে এই রক্তে মাংসে গড়া মানুষটির জায়গা হতে পারে কোন এক বাঁশ বাগানের অতন্ত্র গহ্বরে। সেই সময়ের আগে চলো আমরা সেই জগতটা গুছিয়ে নেই, আজ থেকে, এই রমাদান থেকে।

তথ্যসূত্রঃ-

[১]সহীহ বুখারী(১৯০১)

খোশ-রোজ রমাদান

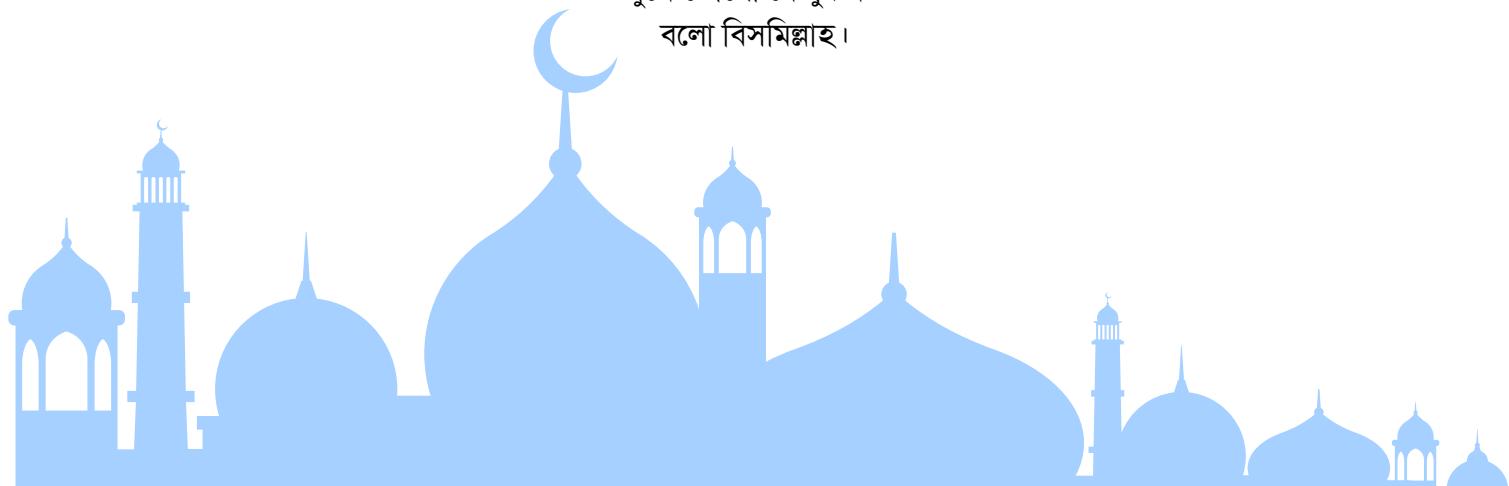
ইউসুফ ইমাম, দ্বাদশ শ্রেণী
বেলকুচি সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ

বিস্তীর্ণ পথ পেরিয়ে অনেক হেটেছি—
খোলা আকাশের নিচে তপ্ত পদদলে
ক্ষুধার কাফন গায়ে মাখিয়ে।
মাথার উপরে সূর্য হাসে
নিচেতে মরু গোঙায়।
আমি ভুখা বহু পথ হেঁটেছি—বেদুইন বেশে,
তবু খাইনি একফোটা জল
সময় হয়নি বলে।

উৎপীড়নের আমামা পড়ে
দিল্লির মনে সাচা ইশকে
সিয়াম রেখেছি আল্লাহর নামে।

জীবনের সমস্ত পাপ ঘোচাবে বলে
এসে পড়েছে রহমতের ঐ রামাদান,
ওপারেতে সূর্য পড়েছে নুয়ে
তাই পথরেখা হয়েছে অম্বান।

আবছায়া রাত্রির চাদরে জড়ানো চাঁদ উঠেছে ঐ
তামাম দুনিয়ায় ভুখা আজ গিয়েছে কই?
মিনারের উপরে আজান ভাসে সুর আসে কানে কানে।
কোন ভুখা আজ খায়নি খাবার না খেয়ে এই রমাদানে?
কোথায় তাদের ভুখার জ্বালা স্মৃতির আঁধারে?
একটু দূরে আজান ভাসে মসজিদের মিনারে
ইফতার করো আজান দিয়েছে হয়েছে সূর্যাস্ত
রোজা ভাঙ্গে ভুখা এবার
আল্লাহর নামে
মুখে তোলো খেজুর খণ্ড
বলো বিসমিল্লাহ।



হিফিয়ুল কুরআন: একটি অবহেলিত অথচ ঔরুজ্বপূর্ণ সুন্নাহ

-মুহাম্মাদ গোলাম রাক্কানী



কুরআন নাজিল হওয়ার সময় থেকেই সাহাবিগণ কুরআন মুখস্ত করার প্রতি খুব ঘনোয়োগী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কী বিপুল পরিমাণ হাফিজ ছিলেন, তার একটি জ্ঞান প্রমাণ হলো, নবীযুগে বীরে মাউনার প্রসিদ্ধ ঘটনায় শাহাদাতবরণকারী কারী (কুরআনের হাফিজ-আলেম) সাহাবিদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-র যুগে ইয়ামামার যুদ্ধেও ৭০ জন হাফিজ সাহাবি শহীদ হন।^[১] হাফিজ সাহাবিদের নামও স্বয়ত্ত্বে ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে।^[২]

এ তো গেল নবীযুগ আর সিদ্ধিকী যুগ। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের যুগ তো এর পরও আরো কত প্রলম্বিত ছিল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-র খেলাফতকালে কুরআন এক মলাটে লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও হিফজ করার আগ্রহে কোনো ক্ষমতি নেমে আসেনি। জীবিকার প্রয়োজনে যার ব্যক্ততা যেদিকেই থাকুক না কেন, কুরআন মুখস্ত করার ক্ষেত্রে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সাধ্যান্যুযায়ী হিফজের চেষ্টা অব্যাহত ছিলো প্রায় সবার মাঝেই। আমাদের সালাফে সালেহীনের যুগেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

হালে আমাদের লিবারেল সেকুলার সমাজে এসে কুরআন হিফজের প্রতি আগ্রহে ক্ষমতি শুরু হয়। একটা নির্দিষ্ট বয়স এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হতে শুরু করে। বর্তমানে তো বিষয়টা যেন অসাধ্যে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন অজুহাতে আমি-তুমি-আমরা হিফজ করার কাজটা থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করি। কুরআন মুখস্তের কাজটি হিফয়খানায় ভর্তি না হলে করা যাবে না, এমন চিন্তা ভুল। হিফয়ের কোনো বয়স নেই। সারা জীবন এটা চলমান। সাহাবিরা তো অনেকে বয়স্ক অবস্থায় হিফজ করেছেন। মোলোদের কিসের বাধা! যেকোনো বয়সেই মুখস্ত করার অভ্যাস চালু করা যায়।

শুরু করলে পুরো কুরআন করতে হবে, এমনও কিন্তু না। জীবনের শেষ অবধি যদি আধা পারাও হিফজ হয় কম কিসে। আমাদের উদ্দেশ্যে তো চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদিসটি স্মরণ করতে পারি আমরা, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলার নিকট সবচাইতে প্রিয় আমল হলো যা পরিমাণে কম হয় কিন্তু নিয়মিত হয়।’ বর্ণনাকারী তাবেরী কাসেম বিন মুহাম্মাদ বলেন, হ্যবরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই হাদিসের ওপর আমল করার উদ্দেশ্যে যখনই কোন নেক আমল শুরু করতেন নিয়মিত করার চেষ্টা করতেন।^[৩]

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ কিন্তু আমাদের জন্য কুরআনকে হিফজ করা সহজ করে দিয়েছেন। বাকি শুধু হিম্মত করে শুরু করা। সূরা কুমার-এ আল্লাহ চারবার বলেন: “لَمْ‘আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি জিকিরের জন্য। অতএব আছে কি কোন চিন্তাশীল?”^[৪] মুফাসিসরগণ বলেন, জিকিরের দুটি অর্থ: একটি হলো মুখস্ত করা, আরেকটি নসিহত গ্রহণ করা।^[৫]

কিন্তু কঠিন বলে মুখস্ত শুরু না করার অজুহাত কিন্তু কম মানুষের নয়। ‘মোলো’দের মাঝেও এই অজুহাত রয়েছে। আচ্ছা ‘মোলো’র বন্ধুরা একটু তোমাদের ক্লাসের বইগুলো দেখো তো। বীজগণিতের ও জ্যামিতির সূত্র, ইংরেজি, বাংলা কবিতা, ইতিহাসের কত কিছু তোমরা মুখস্ত করছো। মুখস্ত করে ফেলছো পর্যায় সারণির কঠিন কঠিন মৌলের নাম, হিউম্যান বিডির পুরো বৃত্তান্ত; যাকে বলে এনাটমি, আরো কত কী! আর কুরআন মুখস্তের উদ্যোগ এখনও নাওনি। এটা কিন্তু খুবই লজ্জাজনক বিষয়। এই রমাদান থেকেই শুরু করবে ইনশাআল্লাহ।

স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির পড়ার পাশাপাশি কিন্তু কুরআন

তিলাওয়াত, হিফজ ও দ্বিনি পরামর্শদাতার সাহচর্য গ্রহণ করা যায়। প্রফেসর হামিদুর রহমান সাহেবও কিন্তু বুয়েটে পড়েছেন। সাবেক অধ্যাপক ছিলেন বুয়েটের। তিনি এক সাক্ষাৎকার মজলিসে বলেন, সেই ছোটবেলায় কুলে পড়ার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত ও শিক্ষকদের পরামর্শ নিতেন। পর্যায়ক্রমে তাফসীরও পড়েছেন।^[৬]

আরেকটা কথা, মুখস্থ করার সময় কিভাবে কোথেকে শুরু করব সেটা নিয়ে অনেকেই পেরেশানিতে পড়ে যাই। যাদের এখনও হিফজে কুরআনের সুযোগ হয়নি, তাদের জন্য 'হাদিসের আলো' নামক কিভাবের ভূমিকায় মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহল্লাহ কিছু পরামর্শ লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখান থেকে কিছু উল্লেখ করেই শেষ করব। (আগ্রহী পাঠকগণ ঢাইলে পুরো ভূমিকা সেখান থেকে পড়তে পারো, খুব উপকারী)

আমাদের হিফজুল কুরআনের মেহনত এভাবে হতে পারে:-

নামাজের মাসনুন সুরাসমূহ মুখস্থ করতে থাকা। এভাবে একসময় মুফাসসাল-এর সকল সুরা (হজুরাত থেকে নাস পর্যন্ত) এবং মুফাসসাল-এর বাহিরে ঐসব সুরা, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা খোলাফায়ে রাশেদীন নামাজের তেলাওয়াত করতেন, সেগুলো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

[১] সহীহ বুখারী (৮০৯০), (৮০৯৬); ফাতহল বারী ৮/৬৬৪, ৬৬৯-৬৭০

[২] দেখুন, গায়ত্রন নিহায়াহ; ইবনুল জায়ারী ২/৩০৩, ৩৫৮, ফাতহল বারী; ইবনে হাজার ৮/৬৬৮-৬৭০

[৩] সহীহ বুখারী (৬৪৬৪), সহীহ মুসলিম (৭৮৩)

[৪] সূরা কুমাৰ ৫৪/১৭, ২২, ৩২, ৪০

[৫] মা'আনিল কুরআন; ফারারা ৩/১০৮, আত তাফসীরল ওয়াসীত; ওয়াহিদী ৮/২০৯, তাফসীরে বাগাতী ৭/৪২৯, যাদুল মাসীর; ইবনুল জাওয়ী ২৫/২২৫, তাফসীরে কুরতুবী ১৭/১৩৮

[৬] মাসিক আল-কাউসার, আলকুরআন সংখ্যা ২০১৬ ইং পৃষ্ঠা ৫৯-৬৫

[৭] হাদিসের আলো (ছোটদের সহীহ হাদীস শিক্ষা), মুহিউদ্দিন আওয়ামা, অনুবাদ: যাকারিয়া আব্দুল্লাহ, মাকতাবাতুল আশরাফ, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩

হাদিসে যেসব সূরা বা আয়াতের ফজিলত আছে সেগুলো হিফয় করা কিংবা নিয়মিত তিলাওয়াত করা, যাতে তা মুখস্থ হয়ে যায়।

কুরআনে দোয়ার আয়াতসমূহ মুখস্থ করা।

দ্বিনের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে একটি দুইটি করে আয়াত মুখস্থ করতে থাকা।

যেসব আয়াত শুনে কারো ঈমান নসিব হয়েছে, কেউ গুনাহ থেকে ফিরে এসেছে, কারো বিশেষ হালত(অনুভূতি) পয়দা হয়েছে বা চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে, ওই সব আয়াত মুখস্থ করতে থাকা।

যে আয়াতগুলো তিলাওয়াতের সময় তোমার নিজের মধ্যে কোন হালত পয়দা হয়েছে সেগুলো নোট করা এবং বারবার পড়ে মুখস্থ করা।^[৮]

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তোমাকে সকলকেই হিফজের মহা নিয়ামতে ধন্য হওয়ার তাওফিক দান করুণ।

মুখ খুঁজি

সোহানুর রহমান আশিক

সুখ খুঁজি কিরাতে
ইমামের সুরে,
সুর শুনে মন ভরে
জাগ্রাতি নুরে।

সুখ খুঁজি সালাতে
সিজদাতে নুয়ে,
শত পাপ-কালিমা
মুছে যাক ধুয়ে।

সুখ খুঁজি সিয়ামে
জাগ্রাতী স্বাদে,
তরু মন সারাঙ্গণ
তাঁর ভয়ে কাঁদে।



আমায়কে কাজে লাগাই

মাহবুব ছাসেন রাফি

সময় মুমিনের বড় মূলধন ও পুঁজি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এই অল্প সময়ের মধ্যে যত পারা যায় নেক কাজ করে যাওয়া এবং নেকি অর্জন করাই মূলত মুমিনের মূল টার্গেট। এটাই একজন মুমিনের প্রধান লক্ষ্য। তাই একজন মুমিনের উচিত তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সর্বোচ্চ সৎ ব্যবহার করা। একজন প্রকৃত মুমিনের স্বরূপ খুলাইদ বিন আব্দুল্লাহ রহিমাহল্লাহ-র কথায় সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

তিনি বলেন, ‘তুমি মুমিনকে তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন একটিতে লিঙ্গ দেখবে। হয় সে মসজিদ আবাদ করবে (সালাত, যিকির, তিলাওয়াত, ইলমের উদ্দেশ্যে) বা ঘরে অবস্থান করবে, অথবা পার্থিব কোনো বৈধ প্রয়োজন পূরণ করবে।’^[১]

কিন্তু বর্তমানে আমাদের মধ্যে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এই সময়ের কত অবমূল্যায়ন হয়ে থাকে? বিশেষ করে আমরা—কিশোর থেকে তরুণ বয়সী ছেলে-মেয়েরা সময়ের অপচয় করি লাগামহীনভাবে। সকাল ১০-১১টা বাজিয়ে ঘুম থেকে ওঠা, সারাদিন গেইমিং-ট্রিলিং-আডভাবাজি করা, গার্লফ্রেন্ড-জাস্টফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ানো আর অকারণে রাত জাগা। এগুলো প্রতিটিই মারাত্মক ব্যাধি। কিন্তু, বর্তমান তরুণ প্রজন্মের শতকরা সিংহভাগই এর কোনো একটিতে আক্রান্ত। এমনি তাদের কাছে এগুলো ডাল-ভাত, লাইফস্টাইলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি যদি

গেমস খেলেই বাকি সময়গুলো বিনষ্ট করা হয়, তাহলে দীনি ইলম অর্জনের সময় কিভাবে হবে?

মুমিন এমন হয় না। এসব থেকে মুমিন মুক্ত থাকে। জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান তো সে মুমিন, যে সময়ের গুরুত্ব বোঝে। নিজের সময়কে কাজে লাগিয়ে কোনো উপকারী ইলম অর্জন করে। নিজেকে দুনিয়ার পাপাচার থেকে মুক্ত রাখার উপায় খোঁজে। যুবক বয়সে নিজের জীবনকে মূল্যবান করার কাজে ব্যস্ত থাকে। হাফসা বিনতে সিরিন রহিমাহল্লাহ বলেন, ‘হে যুবকদল, তোমরা আমল করো, কেননা যৌবনই আমলের মোক্ষম সময়।’^[২]

চলো ভাই! আমাদের যাত্রাপথ বদলে ফেলি। আধিরাত পানে ছুটি। সামনে রমাদান রহমতের মাস, বরকতের মাস, নাজাতের মাস এই রমাদান। আসো ভাই, আমরা আমাদের আমল পালটে ফেলি।

অন্তত রমাদানে
সময়ের কদর
করি, সময়কে
কাজে লাগাতে
নিচের পয়েন্টগুলো
দেখে আমল করতে
পারো, ইনশাআল্লাহ
উপকারে আসবে।



“

তুমি মুমিনকে তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন একটিতে লিপ্ত দেখবো হয় মে
মসজিদ আবাদ করবে (সালাত, যিকির, তিলাওয়াত, ইলমের উদ্দেশ্যে) বা ঘরে
অবস্থান করবে, অথবা পার্থিব কোনো বৈধ প্রয়োজন পূরণ করবো”

- সময় বিনষ্টকারী উপাদানগুলো থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করি।
- খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করি।
- দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে এসে পড়ি।
- পিতামাতার সাথে সম্বৃদ্ধির কাজ।
- ইলম অন্঵েষণ করি।

এই রমাদানে চাইলে আমরা তাহজুদের অভ্যাসও গড়ে তুলতে পারি। নয় কি?

যদি নিয়ত করি, পুরো রমাদানে একদিনও ১২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্তাদাহ মিস করব না। পারব না?

রমাদানের প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত শুরু করা কি
সম্ভব না? সম্ভব তো!

এভাবে রমাদানের সময়কে কাজে লাগানো যায় না? কি
বলো? যায় তো!

‘কোনো এক ঈদের দিন। কাজী শুরাইহ রাহিমাহল্লাহ
হেঁটে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি একদল যুবকের
পাশ দিয়ে গেলেন। দেখলেন যুবকরা খেলায় লিপ্ত।
শুরাইহ তাদের বললেন, ‘তোমরা কেন খেলতামাশায়
লিপ্ত আছ?’ যুবকরা উত্তর দিলো, ‘আমরা অবসর, তাই
খেলছি’ শুরাইহ বললেন, ‘অবসর সময়ে কি তোমাদের
এমনটা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে?’[৩]

আল্লাহ আমাদের সকলকে সময়ের সর্বোচ্চ সম্বৃদ্ধির
করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

[১] যাওয়ায়িদু ‘আদিল্লাহ ‘আলা কিতাবিয যুহুদ লি-আহমাদ (১৩৩০),
আরো দেখুন: আল ওয়ারা’; ইবনু আবিদ দুন্যা (১৪২)

[২] ইকতিয়াউল ইলমিল আমাল; খতীব বাগদানী (১৯০)

[৩] আয যুহুদ; আহমাদ বিন হাম্বাল (১১৯৩), আয যুহুদ; ওয়াকী’ ইবনুল
জাররাহ (৩৬৮), আয যুহুদ; হামাদ ইবনুস সারী ২/৩৫৭





প্রথম ও শেষ রমাদান

জুয়াইরিয়া বিনতে খাঁন দশম শ্রেণি

মান্দারী ইসলামিয়া আলিম মডেল মাদ্রাসা, লক্ষ্মীপুর

হসপিটালের বেডে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে আদিবা। চোখের পাতা বন্ধ করতেই মৃত্যু যন্ত্রণাটা চোখের সামনে ভেসে আসে। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় শরীর থেকে ঘাম ঝারছে। ২৫টা রোজা শেষ হয়েছে। প্রাণ বয়স্ক হওয়ার পর এই প্রথমবার এতগুলো রোজা সে রেখেছে। আদিবার মনে পড়ে অতীতের কাজকর্ম। অসুস্থ শরীর নিয়ে ভোর রাতে রবের সাথে কথোপকথনের সময় আদিবা খুব লজ্জিত থাকে। খুব বিনয়ী সুরে রবের কাছে ক্ষমা চায়। মনে পড়ে যায় তার সেই পুরোনো অতীত!

গতবছরের সেই সময় রমাদান মাস চলছে। কলেজ থেকে ফিরেই আদিবা গড়গড় করে ঠাণ্ডা পানি খেয়ে নিলো। মেয়ের এই স্বভাব নিলুফার কাছে মোটেও অচেনা নয়! বছরের পর বছর তিনি এগুলো সহ্য করে এসেছেন। সবসময় আল্লাহর কাছে মেয়েটার হিদায়েতের জন্য চোখের পানি বিসর্জন দেন। একমাত্র মেয়ের এমন কর্মকাণ্ডে তার হৃদয়টা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। মেয়েকে অনেক বুঝিয়েছেন। এখন তিনি একদম চুপচাপ হয়ে গেছেন।

একদিন একজন সিনিয়র বোনের সাথে বসে ছিলো আদিবা। কথার এক পর্যায়ে রমাদান বিষয়টা উঠে আসে। বড় আপু ক্ষীণ স্বরে আদিবাকে প্রশ্ন করলো, ‘আদিবা রমাদান মাসে কী কী আমল করা হয়? জানো তো রমাদানে একটা কাজ করলে সন্তুষ্ট কাজের

সাওয়াব পাওয়া যায়। অতএব রমাদান হলো আমাদের জন্য স্পেশাল কিছু।

বড় আপুর কথায় আদিবা মাথা নিচু করে বসে থাকে। পাশ থেকে একজন বলে উঠে, ‘ফাতিমাহ আপু আদিবা তো রোজা রাখে না।’ আদিবা বলে, ‘যারা গরিব তারাই না-কি খাবার বাঁচানোর জন্য উপবাস করে।’

ফাতিমাহ বেশ কিছুক্ষণ ভাবল। কিছু একটা মনে করে আদিবা ছাড়া সবাইকে ঢেকে দেখে বলে। আদিবার হাত দুটো ধরে বলতে শুরু করলো:

- আদিবা তোমার তো যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তুমি জানো তোমার ওপর রোজা রাখা ফরজ?
- জি জানি।
- তোমার আশ্মু রোজা রাখেন?
- আমি ছাড়া সবাই রোজা রাখে।
- তোমাকে রাখতে বলে না?
- আগে বলতো, এখন সবাই চুপসে গেছে।

ফাতিমাহ আদিবার পাশ ঘেঁষে বসলো।

- মৃত্যুকে বিশ্বাস করো আদিবা?
- কি বলেন আপু! আমি একজন মুসলিম মৃত্যুকে কেন বিশ্বাস করব না। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায় করি।
- মাশাআল্লাহ! মাশাআল্লাহ! আদিবা নামাজ যেমন তোমার উপর ফরজ; তেমন রোজাও ফরজ। বোন! তুমি নামাজ পড়লে অথচ রোজা রাখলে না, তা কি হয় বলো তো?
- আপু রোজা রাখতে আমার কষ্ট হয়।
- তুমি কেবল দুনিয়ার সামান্য কষ্টের কথাই ভাবছো? এই কষ্টের প্রতিদান আল্লাহ তোমাকে দিবেন। ভেবে দেখেছো কখনো জাহানামের কষ্ট কত বেশি হতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ‘আপনি বলে দিন, জাহানামের আগন্তনের উত্তাপ প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকতো।’[১] আচ্ছা আদিবা একটু চোখ বন্ধ করে জাহানামে নিজে কল্পনা করো তো। সহ্য করতে পারবে আগন্তনের আঁচ, সাপ বিচ্ছুর কামড়, ভয়ংকর আজাব?

আদিবা ছলছল চোখে ফাতিমার দিকে তাকিয়ে বলল:

- আপু আমি এখন কি করব? আমি তো জাহানামের আজাব সহ্য করতে পারব না।
- আল্লাহর কাছে ফিরে এসো বোন।
- আপু, আমার গুনাহ তো পাহাড় সমান! আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন?

ফাতিমা মুচকি হেসে বলল:

- অন্তর থেকে ক্ষমা চেয়ে দেখো। তুমি রবকে অনুভব করো, প্রশংস্তি পাবে।

আল্লাহ তাল্লা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন, ‘হে নবি! আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি বড়ই ক্ষমশীল

ও করুণাময়।’[২] অন্য আয়াতে বলেছেন, ‘অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা করুল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে; এরাই হলো সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।’[৩]

আচ্ছা আদিবা কখনো মনে হয় না এই রমাদানই তোমার জীবনের শেষ রমাদান? একটু ভাবো, রবের নিকট কি জবাব দিবে? তিনি তো তোমার ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে আছেন। বোন! রব তোমাকে ফিরিয়ে দিবেন না। অতীতের জন্য একটু কোমল হও, তোমার চোখ গুলো একটু অশ্রসিঙ্গ করো। আদিবা তুমি তো আমার বোন! আমি তোমার খারাপ চাই না। গভীর রাতে রবের কাছে বাচ্চাদের মতো কান্না করে দেখো। তৃষ্ণি পাবে, পরম তৃষ্ণি। বোন! সবসময় মনে রেখো, ‘নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যে আর অবশ্যই আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।’[৪]

আদিবার অন্তর আল্লাহর কাছে এসে পরম আনন্দ পেয়েছে। অতীতের কথাগুলো ভাবতেই চোখের কার্ণিশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফেঁটা অশ্রু। রাত যত গভীর হয় আদিবার শরীর নিষ্ঠেজ হয়ে পড়ে। কখন যে রবের নিকট পাড়ি জয়াবে সারাদিন বসে বসে সেটাই ভাবতে থাকে।

২৯ টা রমাদান শেষ। আকাশে ঈদের চাঁদ উঠেছে। হসপিটালের বেডের পাশের জানালা দিয়ে এক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আদিবা। আশেপাশের বাসা থেকে ছোট ছোট বাচ্চাদের আনন্দের ধ্বনি আদিবার কানে বারবার বাড়ি খাচ্ছে। আকাশটা নাকি নীল। তবে আদিবার কাছে কেমন ঘোলা ঘোলা লাগছে। হসপিটালে আদিবা একাই আছে। আবু-আশ্মুকে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছে। জায়নামাজে বসে আদিবা রবের কাছে আকৃতি-মিনতি করছে। অতীতের গুনাহ গুলোর জন্য ক্ষমা চাইতে চাইতে আদিবা জায়নামাজেই হেলে পড়ে। আদিবা মৃত্যু বরণ করেছে! আল্লাহ তার প্রিয় সৃষ্টিকে করুল করে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন! এর চেয়ে খুশির কী হতে পারে!

‘নিঃসন্দেহে তোমাকে ফিরে যেতে হবে, তোমার রবের কাছে।’[৫]

তথ্যসূত্রঃ-

[১]সূরা তাওবাহ (আয়াত ৮১)

[২]সূরা হিজর (আয়াত ৪৯)

[৩]সূরা আন নিসা (আয়াত ১৭)

[৪]সূরা বাকারা (আয়াত ১৫৬)

[৫]সূরা আলাক (আয়াত ৮)

হারামা অনুভূতি

ই ফ তে খা র সি ফা ত



৩ সলামী শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তি মুসলিম দেশসমূহে পশ্চিমাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মুসলিম প্রজন্ম ক্রমান্বয়ে ইসলামের যেই মহামূল্যবান জিনিসটি হারিয়েছে সেটা হলো গায়রাত, দ্বিনি আত্মর্যাদা এবং ইসলামী শরীয়াহর প্রতি স্বত্বাবজ্ঞাত সংবেদনশীলতা। গায়রাত এমন এক শক্তিশালী অনুভূতি যা বান্দাকে আল্লাহর দ্বীন পালন ও তার উপর অটল থাকতে সহায়তা করে। ইসলাম সামগ্রিকভাবে মুসলিমদেরকে প্রতিপালন করে এই গুণেরই উপর।

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহল্লাহ বলেন, দীনের মূল ভিত্তি হলো গায়রাত। যার গায়রাত নেই তার কোন দীন-ই নেই। এজন্যই দাইয়ুস আল্লাহর সৃষ্টিজীবের নিকৃষ্ট ব্যক্তি, যার উপর জানাত হারাম হয়ে যায়।^[১]

গায়রাত এমনই একটি মহৎ গুণ যা মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে শুরু করে নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম, সাহাবায়ে কেরাম, উলামায়ে আসলাফ সকলেই এই গুণে গুণাদিত্ব ছিলেন। হাদীস শরীফে এসেছে,

‘আল্লাহর থেকে বেশি গায়রাতসম্পন্ন কোন সন্তা নেই। এজন্যই তিনি প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য সমস্ত অঞ্চলতাকে হারাম করে দিয়েছেন।’^[২]

নবী রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের গায়রাত নিয়েও অসংখ্য বর্ণনা আছে। তার মধ্যে কেবল একটি হাদীস আমি এখানে

উল্লেখ করছি। এই হাদীস থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের গায়রাত সম্পর্কে আমরা জানতে পারব। একবার সাদ বিন উবাদা রা. বললেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে (গায়রে মাহরাম) কোন পুরুষকে দেখি তাহলে আমি তরবারি দিয়ে তার গর্দান ফেলে দিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাদের এই বঙ্গব্য পৌঁছলে তিনি সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা কি সাদের গায়রাত দেখে আশ্চর্য হচ্ছে? আল্লাহর শপথ! আমি সাদের থেকেও বেশি গায়রাতসম্পন্ন এবং মহান আল্লাহ তায়ালা আমার থেকেও বেশি গায়রাতসম্পন্ন।^[৩]

ইসলামের গায়রাতের ধারণাটা অনেক ব্যাপক। এটা কেবল স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সততা বজায়ের ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পুরো ইসলামী শরীয়াহর প্রতি গভীর সংবেদনশীলতা এবং দায়িত্ববোধের নাম হলো গায়রাত। যে কোনো পাপাচারের প্রতি ঘৃণাবোধ এবং যে কোনো সৎকর্ম ও নির্দর্শনের প্রতি ভালবাসা থাকার নাম গায়রাত। উলামায়ে কেরাম গায়রাতকে মৌলিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হলো প্রশংসিত, আরেকটি হলো নিন্দনীয়। প্রশংসনীয় গায়রাত হলো, যেটা বান্দাকে আল্লাহর দেয়া শরীয়াহর প্রতি সিরিয়াস করে তোলে। আর নিন্দনীয় গায়রাত হলো, যেটা বান্দাকে আল্লাহর দ্বীন পালনে লজ্জিত ও ইতস্তত করে তোলে।

বর্তমান সময়ে আমরা এই বিভাজনকে এভাবে ব্যক্ত করতে পারি যে, ইসলামী গায়রাত ও পশ্চিমা গায়রাত। আজকে

ইসলামের প্রতি আমাদের গায়রাত নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি গায়রাত বেড়ে গেছে। দাঢ়ি রাখতে আমাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে, কাটতে নয়। হিজাব পরতে ইতস্ততবোধ হচ্ছে, হিজাব খুলতে নয়। আমরা যতটা না ইসলামের প্রতি সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল, তার থেকেও বেশি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল হয়ে উঠছি।



**‘আল্লাহর থেকে বেশি গায়রাতম্পন্ন কোন মন্ত্র নেই। এজন্যই
তিনি প্রকাশ- অপ্রকাশ মন্ত্র অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন।’**

সহীহ মুসলিম : ১৩৯৮

থাকাটা পাপে সহায়তা, দীনহীনতা ও অসৎ কাজে অন্যকে নিষেধ করার দায়িত্ব হেড়ে দেয়ার নামাত্তর।^[৫]

বর্তমান প্রজন্মের গায়রাত নষ্ট হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ হলো, অশ্লীলতা ও ফাসাদ বিস্তারকারী মিডিয়া জগত এবং ফ্রি মিস্কিংয়ের পরিবেশে বিচরণ করা। ফিল্ম, নাটক, আইটেম সং, হারাম রিলেশন ও নারীঘেঁষা বিভিন্ন প্রচারণার ফলে মুসলিমদের গায়রাত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে

অভিভাবকরা সন্তানদেরকে ফ্রি মিস্কিংয়ের পরিবেশে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। মেয়েদেরকে কথিত বয়ফ্ৰেন্ড ও বন্ধুর সাথে যেথায় সেথায় ট্যুরে যাওয়ার জন্য স্বাধীন হেড়ে দিচ্ছে। উন্মত্তের ছেলেরা অবাধে আজকে গানবাদ্য ও গাইরে মাহরাম নারীদের সাথে সময় কাটাচ্ছে। উন্মাহর মেয়েরা কেন প্রকার ইতস্ততবোধ ছাড়াই ফ্রি মিস্কিংয়ে লিপ্ত হচ্ছে ও পর্দাহীনতার কালচারে জড়িয়ে পড়ছে। স্বামী তার স্ত্রীকে পুরুষদের বাজারে হেড়ে দিচ্ছে। অথচ গায়রাত সম্পন্ন কোন মুসলিম-মুসলিমাহ এই কাজগুলো করতে পারে না।

আজকে আমাদের ঈমানি গায়রাত এতটাই হ্রাস পেয়েছে যে, অশ্লীলতা ও হারাম বিনোদনের তারকা-সেলিব্রেটিদের প্রতি নিজেদের সর্বোচ্চ ভালোবাসা ও উন্মাদনা উজাড় করে দিচ্ছি। অথচ ইসলাম ও মুসলিম উন্মাহ নিয়ে আমাদের মাঝে তেমন ভালবাসা ও উন্মাদনা কাজ করে না। এসব জাহেল সেলিব্রেটি আক্রান্ত হলে আমরা যতটুকু ব্যথিত ও সরব হই, ইসলামের কোন বিধানের উপর আঘাত আসলে তার ছিটেভাগও সরব হই না।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলছেন, আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে গিয়ে তোমাদের অন্তরে যেন দয়ার উদ্রেক না হয়।^[৬]

শাহিখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহ্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাপাচারীদের প্রতি ভালোবাসা, টান ও আগ্রহ রাখতে নিষেধ করেছেন। কারণ কেবল এই টানের কারণেই অনেকে পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং গায়রাতহীন হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করে এদের প্রতি ভালোবাসা ও টান থাকাটাই উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং এই টান

ইসলামের সুস্পষ্ট হারাম বিষয়গুলো স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। এবং এগুলোর প্রতি তাদের স্বভাবজাত যেই ঘৃণাবোধ থাকার কথা ছিল সেটা হারিয়ে যাচ্ছে।

শাহিখ আব্দুল্লাহ আল ফাওজান বলেন, কোনো মানুষ যদি এমন স্থানে অবস্থান করে যেখানে অধিকহারে পাপাচার হয়, তা হলে তার গায়রাত হ্যত দুর্বল হয়ে যাবে কিংবা একেবারেই মরে যাবে।^[৭]

এজন্যই দেখা যায়, মুসলিমদের মধ্যে যারা কাফেরদের দেশে পড়াশোনা করতে যায়, তাদের দ্বীনি গায়রাত একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমান শিক্ষাজ্ঞন, শপিং মল, বিনোদন স্পট এবং বড় বড় রেস্টোরাঁগুলোও ফ্রি মিস্কিং ও পাপাচারের পরিবেশে রূপ নিয়েছে। ফলে এইসব পরিবেশে যারা অধিক পরিমাণে বিচরণ করছে তাদের গায়রাতও হৃষ্মকির মুখে পড়ছে।

[১] আল জাওয়াবুল কাফি, ৬৮

[২] সহীহ বুখারী(৫২২০)

[৩] সহীহ মুসলিম(১৩৯৮)

[৪] সূরা নুর (২৪:২)

[৫] মাজমু'তুল ফাতাওয়া(১৫/ ২৮৭.২৮৮)

[৬] হস্তুল মামুল বিশারহি সালাসাতিল উসূল (১৭৬)

ମୁହାମ୍ମଦ



ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତିକଳାଯ ପରେ ଖୁଣ୍ଡି ଫିଦେ

ଆ ର ଫା ତ ତା ଯ କି ଯା ହ

ଚଲୋ ତୋମାକେ ନିଯେ ଏକଟୁ ସୁରେ ଆସି ପ୍ରାୟ ସାଡେ ଚୌଦ୍ଦଶ
ବଚର ଆଗେର ଏକ ମରୁ ଜନପଦ ଥେକେ ।

ମଙ୍କାର ପରିଷ୍ଠିତି ଥମଥମେ! ଇସଲାମେର ଉଥାନେର ପର ଥେକେଇ
କିଛୁ ମାନୁଷ ଅଧିକ ଆଗହେ ଚେଯେ ଆହେ ମୁହାମ୍ମଦ ﷺ-ର ପତନ
ଦେଖବେ ବଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାହ ଯାକେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଦାନ କରେଛେନ କେ
ତାକେ ପଦାନତ କରବେ? ଆବୁ ତାଲିବ ମାରା ଗେଛେନ, ଅଥଚ
ଏଥନେ ମୁହାମ୍ମଦ ﷺ-ର ସାଥେ କୁରାଇଶଦେର କୋନ ମୀମାଂସା
ହେଯନି । ଦୀର୍ଘଦିନେର ଆଗ୍ନେର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଯେନ ଶୁକନୋ କାଠ ପେଯେ
ପୁନରାୟ ଜୁଲେ ଉଠିତେ ଚାଇଛେ ।

ଏକଦିନ ଶ୍ୟାତାନେର ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀୟ ଦାରଳନ ନାଦଓୟାର ଏକ ବୈଠକେ
ମୁହାମ୍ମଦ ﷺ-କେ ହତ୍ୟାର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଁ ଯାଯ । ରାତେ
ହତ୍ୟାକାରୀ ଦଲ ଅଧିକ ଆଗହେ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଥାକେ କାଞ୍ଚିତ
ସମୟେର ଜନ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଯାକେ ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଲା ନିରାପତ୍ତା ଦାନ
କରେଛେ ତାକେ ହତ୍ୟା କରତେ ଆସା ତୋ ନିଛକ-ଇ ବୋକାମି
ଛିଲ ।

ମଙ୍କାଯ ପରିଷ୍ଠିତି ଇସଲାମେର ଜନ୍ୟ ଯତ କଠିନ ହଚିଲ
ମଦିନାର ପରିଷ୍ଠିତି ହଚିଲ ତତ ପ୍ରଶନ୍ତ । ନବୀଜି ﷺ
ଆଜ୍ଞାହର ଆଦେଶେ ମଦିନା ହିଜରତ କରଲେନ । ସେଥାନେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରଲେନ ମାସଜିଦୁନ ନବବି । ଶୁରୁ ହଲେ ଇସଲାମୀ
ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କାଜ । ସାହାବୀଗଣ ନିଜେଦେର ସକଳ ସହାୟ-
ସମ୍ପଦି ଏମନକି ଆହ୍ୱାନ-ସ୍ଵଜନକେଓ ତାଗ କରେ ମଦିନାଯ
ପାଢ଼ି ଦିଯେଛିଲେ ଦ୍ୱାନେର ଜନ୍ୟ । ସୁହାଇବ ବିନ ସିନାନ ରାମି

ରାଦିଯାଜ୍ଞାହ ଆନନ୍ଦର କଥା ଜାନୋ କି? ତିନି ତାଁ ସକଳ
ସମ୍ପଦ କୁରାଇଶଦେର ଦିଯେ ତବେଇ ମଦିନାଯ ହିଜରତ କରତେ
ପେରେଛିଲେନ । କିଂବା ଆବୁ ସାଲାମା ରାଦିଯାଜ୍ଞାହ ଆନନ୍ଦ;
ଯିନି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନକେ ଫେଲେ ମଦିନାଯ ହିଜରତ କରତେ
ବାଧ୍ୟ ହରେଛିଲେନ । ତାଦେର ସାମନେ ଛିଲ ଅନିଶ୍ଚିତ
ଭବିଷ୍ୟৎ! ଏତ ବଚରେର ସାଜାନୋ-ଗୋଛାନୋ ଘରବାଡିର
ମାୟା ତାଗ କରେ ତାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଲୋ ଆଜ୍ଞାହର ଭକ୍ତିକେ ।
କତ ସ୍ମୃତି, କତ ଅନୁଭବ-ଅନୁଭୂତି । ଭାବତେ ପାରୋ ତୁମି?
ଆନସାର ଭାଇୟେରାଓ ମୁହାଜିର ଭାଇଦେର ଆପନ କରେ
ନେନ । କାହେ ଟେନେ ନେନ ନିଜେର ଭାଇୟେର ମତନ କରେ । କି
ଅଭୂତ ଛିଲ ସେଇ ଭାତ୍ତବୋଧ!

ମୁସଲିମରା ପ୍ରଥମ ଈଦ ପାଲନ କରେଛିଲ ବଦର ଯୁଦ୍ଧେର ପର ଦିତୀୟ
ହିଜରି ସନେ । ତାଦେର ସେଇ ଈଦ ଛିଲ ତାଗେର ଈଦ, ଉଚ୍ଚାସ-
ଆନନ୍ଦେର ଈଦ । ସେ ଈଦ ଏସେହିଲ ତିତିକ୍ଷାର ଜୋଯାରେ ଭେସେ ।
ସେଇ ଈଦେର କିଛୁଦିନ ଆଗେଇ ମୁସଲିମ ଆର କାଫେରଦେର ମଧ୍ୟେ
ପ୍ରଥମ ସଶତ୍ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଁ, ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧ । ଆଜ୍ଞାହ ମୁସଲିମଦେର ଏହି
ଯୁଦ୍ଧେ ଜୟ ଦାନ କରେଛେ ତାଦେର ତାକଓୟାର ଜନ୍ୟ । ତାଇ ସେଇ
ତାଗେର ଈଦ ଛିଲ ବଡ଼ି ଆନନ୍ଦେର । ମୁସଲିମରା ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ
ଛିଲ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାହର ଶୁକରିଯା ଆଦାୟ କରେଛିଲ । ତାଦେର
ତାକଓୟା ଆରୋ ବୃଦ୍ଧି ପେଯେଛିଲ ।

ଅଥଚ ତୋମାର-ଆମାର ଈଦ କାଟେ ଆଜ୍ଞାହର
ନାଫରମାନିତେ! ଈଦେର ଚାଁଦ
ଦେଖେ ତୁମି ଉଚ୍ଚ



শব্দে সাউন্ড বক্সে গান শোনো, গভীর রাত অবধি বন্ধুদের নিয়ে পার্টি করো। অথচ তুমি তো এটা ও জানো না তোমার রোজা আল্লাহ্ কবুল করেছেন কি-না! গত হয়ে যাওয়া ক্ষমার মাসে তোমাকে তিনি ক্ষমা করেছেন কি-না! ঈদের দিনে পর্দাহীনতার কারণে কত মানুষের কাছে যে ফিতনার কারণ হচ্ছে যদি সেটা বুঝতে!

এটা তো প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য না! মুসলিমরা তো খুশি হলে আল্লাহর নাফরমানি করে না বরং শুকরিয়া আদায় করে। রমাদান তো তাকওয়া অর্জনের মাস, অন্তর থেকে অপবিত্রতা দূর করে নিজেকে পবিত্র করার মাস। তুমি কতটুকু পারলে

নিজেকে পরিশুল্ক করতে? তোমার জন্য কি এই রমাদানটা যথেষ্ট নয় পেছনের গুনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নেয়ার জন্য?

[১] তারীখুল মাদীনাহ; উমার ইবনে শাবাহ ২/৪৭৯, মুসনাদুল হারিছ বিন উসামা-হিলয়াতুল আওলিয়া; আবু নুআইম ইস্পাহানীর সূত্রে ১/১৫১-, আল মুসতাদুরাক আলাস সহীহাইন; হাকিম (৫৭০৬)

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৬৯, মারিফাতুস সাহাবাহ; ইবনে মানদাহ পৃ ৬৯৮, আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীফিস সাহাবাহ; ইবনে হাজার আসকালানী ৮/৮০৮

[৩] তারীখুল মাদীনাহ; উমার ইবনে শাবাহ ১/১৩৩, আল বাদউ ওয়াত-তারীখ; ইবনে তাহের মাকদিসী ৪/১৯৪, ইমতাউল আসমা'; তাকীউদ্দীন মাকরিয়া ১০/১৭৪

বৃচকি হামির গল্প

একবার হয়েছে কি, একটা ছোট ছেলে; বয়স এই চার বছর মত হবে, তার খুব শখ হলো সেহারি খাওয়ার। একদিন সেহেরির সময় ঘুম ভেঙ্গে গেলে, সে খাবার টেবিলে গিয়ে দেখতে থাকে। দেখে যে ওর আবু-আম্বুরা ভাত খাচ্ছে। ও বিরক্ত হয়ে বিছানায় চলে যায়। শুতে শুতে বলে, ‘এখন তো তোমরা ভাত খাচ্ছা, আমি ঘুমানোর পর যদি সেহারি খাও তাহলে আমার জন্য রেখো। সকালে উঠে একটু খেয়ে দেখব, সেহেরিটা খেতে কি রকম!’

৭

শব্দখেলা



১	২		৩		৪	৫	৬
৭			৮				
৯					১০		
১১					১২		
১৩							
				১৪		১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০		২১		
	২২					২৩	

উপর-নিচ

১. বিজীর্ণ। ৮. সমস্ত। ৭. ‘বক’ এর বিকৃত রূপ। ৮. নদী মাতা যার। ৯. *Oryza sativa* ১০. Pressure ১১. ‘সুন্দ’ এর প্রতিশব্দ। ১২. রক্ষাকারী। ১৩. দ্রুত। ১৪. ঘাম। ১৫. মনিব, অফিসের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। ১৭. দীনের স্বতঃসিদ্ধ ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে কুফরের দিকে পরিচালিত করা। ২১. যে মহিমান্বিত রাতে সর্বপ্রথম কুরআন নাযিল হয়। ২২. অম্বানের সাথে নম্রতা প্রকাশ করা। ২৩. স্রেষ্ঠা।

পাশাপাশি

১. যা ঘটবেই। ২. বাংলা। ৩. ফাতিমা (রাঃ) মুহাম্মদ (সাঃ) এর কি হন? ৪. খবরাখবর। ৫. কর্তৃত যার হাতে। ৬. তালা। ১৫. যে যুদ্ধে মুসলিমদের প্রধান প্রতিপক্ষ আবু জেহেল নিহত হয়। ১৬. যার বিপরীত শব্দ নিরব। ১৮. Creeper এর প্রতিশব্দ। ১৯. যারা হজ পালন করে। ২০. হজ উমরাহ আদায়ে ওয়াজিব ছুটে যাওয়া জনিত ভুল ক্রটি হলে তার কাফফারা স্বরূপ একটি পশ্চ যবেহ করে গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া।

গত মাসের মাঠিক উত্তর

আ	স	র		হি	জ	র	ত
ব				দ্বা		ব	ল
ব	দ	র			তা		
ক		ম	ক্ষা		হা	জি	
র		জা			রা		আ
	আ	ন	কা	বু	ত		মা
	র			খা			ন
গি	ব	ত		রি	সা	লা	ত

গত মাসের বিজয়ীরা হলোঁঁ

মোহাম্মদ জমজম আলী।
মোহাম্মদ বেলাল।
মারইয়াম বিনতে হাসেম।

উত্তর পাঠাবে এই টিকালয় “editor.sholo@gmail.com”। মেইলের Subject এ অবশ্যই “শব্দখেলা” কথাটি লিখতে হবে। বিজয়ী তিনজন পাবে ১০০ টাকা করে “পুরস্কার”।